পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

দ্বিতীয় খণ্ড

বাণী সঞ্চয়ন ও সংকলন

শ্রীজগদীশ্বর পাল

পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

দ্বিতীয় খণ্ড

বাণীসঞ্চয়ন ও সংকলন
শ্রীজগদীশ্বর পাল

পশ্যন্তী প্রকাশনী
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ ষ্ট্রীট
(সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ২২ ভাদ্র, ১৩৮৬
পূজনীয় আচার্য্যদেবের ৯৩তম জন্মদিন

মূল্য ঃ আট টাকা

— প্রাপ্তিস্থান —

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

পরমার্থ প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

নিবেদন

পরমার্থ-প্রসঙ্গে আচার্যদেব স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত অমৃতবাণীর কিছু সংকলন বিগত বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীজগদীশ্বর পালের সযত্ন সংরক্ষণের ফলে তাঁহার এ জাতীয় আরও অমৃত-বাণী সকলের সহজলভ্য হইতেছে। কী অপরিসীম ইহার মূল্য, তাহা অধ্যাত্ম-পথের যাঁহারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী পথিক তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন। হিন্দুদের নানা আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কলাপের পিছনে কী গভীর রহস্য নিহিত আছে তাহা পূজনীয় আচার্যদেব যেন সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাইয়া দিতেন। যেমন এবারের প্রকাশিত সংকলনে তীর্থের প্রসঙ্গে তাঁর সুবিস্তৃত গভীর আলোচনা। তীর্থদর্শনে আমরা সবাই যাই কিন্তু কী উদ্দেশ্যে কেন এ তীর্থযাত্রা, তাহা আমরা উপলব্ধি করি না।

তেমনই সাধনার ফলে যে ঊর্ধ্বগতি লাভ হয় তাহার স্বরূপ কী, দেবযান গতি, পিতৃযান গতি ইত্যাদির তাৎপর্য কী, তাহাও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। আবার শাস্ত্রে কোথাও শোনা যায় সাধকের উৎক্রান্তি বা গতি নাই, আছে শুদ্ধ নিত্য স্থিতি—ইহারই বা সমন্বয় কি করিয়া করা যায় আমরা ভাবিয়া পাই না। পূজনীয় আচার্যদেবের আর্ষপ্রাতিভ দৃষ্টির আলোকে এ সব তত্ত্ব সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইত তাঁহার অমৃত কথালাপে।

তিনি অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতীদের নির্বিচারে নিরন্তর অনলস উপদেশ-ধারায় অভিস্নাত করিতেন যাহাতে তাহারা পথের যথার্থ পরিচয় লাভ করে ও ঠিকমত সেই সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে। শরণাগতি বা ভগবৎপ্রেম অথবা ভাবসাধনার কথা আমরা শুনি বা বলি কিন্তু তাহা ঠিক ঠিক কখন লাভ হয় বা কিরূপ অন্তর্বিকাশের ফলে ভাবদেহের সৃষ্টি হয় এবং তাহা ক্রমশঃ মহাভাবে ও শেষে স্বরূপে মিলিত হয় তাহার কোন জ্ঞানই আমাদের নাই। কিন্তু পূজনীয় আচার্যদেবের ব্যাখ্যায় তাহা যেন আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে এবং মনে হয় তাঁহার দিব্য অনুভূতিলব্ধ বর্ণনার মধ্যে দিয়া তিনি যেন সত্য সত্যই আমাদের সেই ভূমিতে তখনকার মত লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিলেন। সেইরূপ স্বরূপদর্শন কাহাকে বলে, পূর্ণপ্রজ্ঞার বিকাশই বা কখন হয় সবই তিনি যেন অঙ্গুলিনির্দেশে অভ্রান্তভাবে দেখাইয়া দিতেন।

কথোপকথনের ছলে তিনি যেমন বলিয়া গিয়াছেন অবিকল সেইভাবেই শ্রীপাল মহাশয় তাহার অনুলিপি রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে কোথাও কোথাও হয়তো একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে কিন্তু তিনি তত্ত্বকে একেবারে মর্মে প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য এইরূপ জোরের সঙ্গে বারবারই বলিতেন এবং সেইরূপেই তাহার প্রকাশ অবিকৃতই থাকা উচিত ভাবিয়া আমরা কোনো সম্পাদনা করিয়া সুসঙ্গত রচনার রূপ দানে প্রয়াসী হই নাই এবং সে স্পর্ধাও আমাদের নাই। পূজনীয় আচার্যদেব কখনও কখনও কোনো প্রশ্নের উত্তর মুখে না বলিয়া লিখিয়া বা লিখাইয়া দিতেন। সেগুলিতে সাধুভাষা লক্ষ্য করা যাইবে এবং অন্যত্র বেশীর ভাগ স্থলেই কথ্য ভাষায় তাঁহার অমৃতবাণী সংকলিত হইয়াছে।

এই সংকলনের কাজে প্রেস-কপি তৈয়ারী করার ব্যাপারে শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তী বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পূর্বের মত টেম্পল প্রেসের কর্মিবৃন্দ ছাপার বাজারে এই নিদারুণ সংকটেও একান্ত আগ্রহ ও যত্নসহকারে আনুকূল্য না করিলে পূজনীয় আচার্যদেবের ৯৩তম জন্মদিনে এই সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। তাই তাঁহাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীগুরুর আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হউক—ইহাই প্রার্থনা করি।

পূজনীয় আচার্যদেবের জ্ঞান-মন্দাকিনীর কয়েকটি তরঙ্গ এই সংকলনে বিধৃত রহিল। কিন্তু সেই মহাপারাবারের কোন কূল-কিনারা নাই, তা'র কতটা প্রকাশ করা যাইবে জানি না। তবে এই দিব্য প্রবাহের ধারায় তিনি চাহিয়াছিলেন সকলকে অমৃতের ভাগী করিতে। সমষ্টির মুক্তি, শুধু ব্যক্তি-বিশেষের মুক্তি নহে—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। জগতের দুঃখতাপ চিরতরে বিদূরিত হোক্—এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া তিনি অখণ্ড মহাযোগের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। তাহার কিছু আভাস এই সংকলনেও পাওয়া যাইবে। আমরা তাহার গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে না পারিলেও তাঁহার অমৃত-বাণীর বারংবার অনুশীলনের দ্বারা হয় তো কিছুটা মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিব। সেই আশাতেই এই সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ। অলক্ষ্য হইতে সেই দিব্য আত্মার পূত আশীর্বাদ তাঁহার পরম লক্ষ্যের দিকে আমাদের অগ্রসর করিয়া লইয়া চলুক এবং আমাদের সেই সাধনার যোগ্য করিয়া তুলুক—এই প্রার্থনা।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা
৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯



মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ও ঠাকুর সীতারাম ওংকারনাথ
(শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, বারাণসী, নভেম্বর, ১৯৭৫)

শরণাগতি

প্রশ্ন—গীতাতে ভগবান শরণাগতির কথা বলেছেন। শরণাগতিটি কি জিনিস ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

উঃ—গীতাতে ভগবান বলছেন যে তুমি এতসব শুনতে পারবে না, বুঝতে পারবে না, তুমি শুধু 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—তুমি সব ছেড়ে দাও, 'মামেকং শরণং ব্রজ'—শরণ বললেন কেন? যা কিছু করতে হয় আমি করবো, দায়িত্ব আমার। Entire responsibility rests on me, এইরকম—এই রকম ভাবটা মনের মধ্যে—আমার ওপর নির্ভর করো। এমন ভাবে নির্ভর করবে, সব ছেড়ে দেবে। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—তাহলে কি করে আমার সব কাজ হবে?—ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল দুটোই দরকার। কাজেই এমন একটা জিনিস যাতে সবটাই আছে। সেটাই হচ্ছে আমারটা—কি হলো সেটা? যে 'অহং ত্বাম্ সর্ব-পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি।'

সব জিনিসটাই হচ্ছে এক একটা আবরণ থেকে মুক্ত করার জন্য। আমি যা বলছি তা যদি করো তাহলে যত রকমের আবরণ আছে সব থেকেই মুক্ত হবে। এই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়াটার দরকার কি?—যাবার দরকার আবরণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। 'মামেকং'—একলা আমার শরণা-গত হও। শরণাগত হও মানে, ঠিক যেমন যেমন ভাবে আমি তোমাকে চালাবো তুমি ঠিক তেমনিভাবে চলবে। তারপর একটা পাপের থেকে মুক্তির জন্য আর একটা প্রতিকার, আর একটা পাপের থেকে আর একটা প্রতিকার, এইভাবে যত রকমের আবরণ আছে সব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তুমি নিজে চেষ্টা করে করতে পারবে না। আমার ওপর depend করো, নির্ভর করো, আমি করবো সেটা। 'অহং ত্বাম্'···কি সুন্দর কথা—কোনো সর্ত, কোনো conditionই নেই—দশ, পাঁচ নয়, 'সর্বপাপেভ্যঃ' তোমাকে মুক্ত করবো।

তুমি চিন্তা কোরো না। আমাকে ধরে থাকো, তারপরে আমি যা করবো তাই তুমি বুঝে নাও, আমাকে ধরলে সবকে ধরা হয়ে যায়। কিছু বাকী থাকে না। আমি যে সব জিনিসেরই প্রাণ-স্বরূপ। এমন ভাবে আমাকে ধরো। এই একটা শ্লোক গেল। তারপরে আর একটা শ্লোকে

তিনি বললেন কি ? 'বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'—আমাকে যে সব বলে ধরো ধরো, কে ধরতে পারে ? আমাকে ধরতে পারে কি সেই সব ? কেউ পারে না। কেন পারে না বল ? সকলে তাকে ওরকম করে ধরতে পারে না কেন ? যেমন জল সেই টাটকা জল ধরো, ভাত চাই ভাত দাও, মিষ্টি চাই মিষ্টি দাও, যা চাও তাই সে দেবে। এমন কোন দোকান নেই যে দোকানে সব পাওয়া যায়। এক দোকানে এক জিনিস পাবে, অন্য দোকানে অন্য জিনিস পাবে, আর এক দোকানে অন্য জিনিস পাবে। এই জগতেও তাই, বাহ্য জগতেও তাই, দেবলোকেও তাই, সব জায়গাতেই তাই।

কাজে কাজেই এক জায়গাতে সব জিনিস পাবে কোথায় ? অথচ এখানে বলছেন একজনকে যদি ধরো, সে একজনকে ধরলে তোমার সব রকমের অভাব দূর হয়ে যাবে। এটা কত বড় জিনিস—কত বড় প্রলোভনের জিনিস। কোনটা বাদ গেলো না। এক side হয়ে গেল আর বাকীগুলি রয়ে গেল, তা হলো না—কেমন, বাকীগুলোও আমি করে নেব। কিন্তু এটা হয় না কেন ? কি difficulty ? কি অসুবিধা ? মানুষের জীবনের চরিত্রের ভিতর কোনটা defect, ত্রুটি আছে বলো দেখি ? যা গীতাকার স্বয়ং বলেছেন, কি বলেছেন ? "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' কেন এখানে বলেছেন না 'বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"—বহু জন্ম মানুষের কেটে যায়, সেই সব কাটে, জন্ম হয়, আবার করে। আবার জন্ম হয়, এই রকম করে সে চলছে। কিন্তু বহূনাং জন্মনাং অন্তেও কিন্তু প্রপত্তি হয় না। নিজের মন মতো সাধনা করে, সেই সাধনের ফল লাভ করে। ফল লাভ করলেই ফল ভোগ শেষ হয়ে গেলো, আবার ফললাভ করে। আবার কর্ম্ম-সাধনা করে। আমার যখন পিপাসা পাচ্ছে তখন জল খাচ্ছি, কিন্তু যখন ক্ষুধা পাবে ভয়ানক, তখন জল খাই না, ভাত খাই বা অন্য কোনো খাদ্যবস্তু খাই। কাজেই—যে জিনিসটার অভাব হয়, সে জিনিসটা দিয়ে পূরণ করি। কিন্তু অনেক জিনিসেরই অভাব আমার রয়েছে, কি করে হবে সেটা ? তখন বলেছেন, বহু জন্ম কেটে যায়, এইখানেতে কি সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায় মানুষের। উল্টোপাল্টা হয়ে যায় মানে, কখনো এটা করে কখনো ওটা করে, কারণ সব সময়েই দরকার আছে। কিন্তু সবটারই যে সমানভাবে equally দরকার সে রকম জিনিস নেই। সে রকম জিনিস পাচ্ছি না কিছু।

কেন আমি একটা করতে গেলে আর একটা বাদ যায় ? আমি এমন জিনিস চাই, যে জিনিসটার ভেতরের পক্ষ এবং বাইরের পক্ষ সব সমানভাবে

মিলে যায়। তবে তো কাজ হবে? তা না হলে কি করে হবে সেটা? একটা দিক হলো আর একটা হলো না।

এইজন্য বহুজন্ম কেটে যায়। 'বহুনাং জন্মনাং অন্তে' জ্ঞান আসে। এই জ্ঞান কাকে বলে শোনো। বহু জন্ম কেটে যায়, এটা হচ্ছে অজ্ঞানের জন্য। জ্ঞানের জন্ম হলে একটাতেই হয়ে যায়। কেননা জ্ঞানের জন্ম যখন আসে তখনই তার লক্ষ্য একটা হয়। কি সেটা লক্ষ্য বলতো? অজ্ঞানের জন্ম পুনঃ পুনঃ হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানের জন্ম, যদি জ্ঞান এসে যায়, সে জন্মটা কি রকম? এক এক জন্মেতে তোমার যে দিকে tendency যেদিকে প্রবণতা তুমি সেই দিকে চলে গেছ—সেটা ভুল নয়, কিন্তু সেটা পাওয়াতে আর একটা জিনিস বাদ গেলো। সেটাও তোমার, মনে কোরো, দরকার ছিল।

আবার সেটা যখন পাবার চেষ্টা করলে, আবার ওদিককার একটা জিনিস বাদ গেলো, তখন আমি কি করে সামঞ্জস্য করবো সেটার—এইটা হচ্ছে কোন্ সময়েতে?—না, অজ্ঞানের অবস্থাতে। তারপরে জ্ঞানটা আসে। জ্ঞান তো একটাই। যখন জ্ঞান এসে যায়, তখন এ করতে হয় না। জ্ঞান এসে গেলে 'মাং প্রপদ্যতে'—তখন সে প্রপন্ন হয়। প্রপন্ন মানে শরণাগত। তখন তুমি আমাকে ধরলে, আমি তোমাকে ধরলাম। আমি, ক, ও জানি না, খ, গ, কিছুই জানি না। আমি এক তোমাকে জানি, ক দরকার হয় তুমি দেখে দেবে, খ, দরকার হয়, তুমি দেখে বুঝে দেবে। আমার বুঝবার দরকার নেই, আমি এক তোমাকেই জানি। এর নাম হচ্ছে শরণাগতি। আর ওটা হলো আমি নিজে বিচার করবো। 'ক' চাই, কি 'খ' চাই, কি 'গ' চাই, কি 'ঘ' চাই আমি ঠিক করবো। আর এখানে তো তা নয়, এখানে একমাত্র তোমাকেই ধরেছি। তুমি যে ভাবে করিয়ে নেবে সেটাই ঠিক। এই শরণাগত অবস্থা সেটা। এটা কখন হয়?—না, জ্ঞান হলে। অজ্ঞান অবস্থায় শরণাগত কখনো হতে পারে না, পারে না, পারে না।

জ্ঞান যেই এসে গেলো তখন শরণাগতি। 'বহুনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে'—তখন তুমি আমার কাছে প্রপন্ন হবে—প্রপন্ন মানে শরণাগত। কি রকম করে, কিভাবে শরণাগত হবে?—না, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'—সব জিনিসই বাসুদেবের মধ্যে পাওয়া যায়। একজনকে ধরলে সব ধরা হয়ে গেল। সব জিনিসই বাসুদেবের মধ্যে পাওয়া যায়। বাসুদেব এমন একটা বস্তু যেটাকে পেলে কোন জিনিসটা অ-পাওয়া থাকে না। এই হল শরণাগতি। তখন দশটা দিকে মন যাবেই না। কোন দিকে মন যাবে না।

জ্ঞান না হলে সে ভাব আসে না। কিন্তু এই অজ্ঞানে নানা রকম অবস্থা হয়—তারপরে জ্ঞান আসলে আসবে শরণাগতি। কি হল তখন? 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'—সমস্ত কিছুর মূলেই, বাসুদেব। সবই তিনি চালাচ্ছেন—এটাও যে চালাচ্ছে, ওটাও সে চালাচ্ছে—এইটাই যে জেনে গেলো সে জ্ঞানী পুরুষ হয়ে গেল---কিন্তু সে শুদ্ধ জ্ঞানী কি? সে জ্ঞানী-ভক্ত। শুদ্ধ জ্ঞানী আর জ্ঞানী-ভক্তের মধ্যে অনেক difference, অনেক পার্থক্য আছে।

সে হলো জ্ঞানী-ভক্ত। একেই বলে প্রপন্ন-সাধক। কাজেই কি হলো সেটা? আমাকে আর দেখতে হবে না। জ্ঞানীর লক্ষণ কি? জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর difference পার্থক্যটা কি? অজ্ঞানী হচ্ছে তার যে জিনিসটা দরকার সেই জিনিসের জন্য দোকানে যায়—ভাত খাবার দরকার—চাল কেনবার জন্য চালের দোকানে যায়। একজন বলল, আমি তো রুটি খাব—তাহলে ময়দা কেনার জন্য সে দোকানে যায়—সে চালের দোকানে যায় না। আর যখন জ্ঞানী হয়ে যায় তখন থেকে যাই আমার দরকার হয়, তখন সব সে ওই এক জায়গা থেকেই পাওয়া যায়। এমন একটা দোকান আছে, যেখান থেকে চালও পাওয়া যায়, আটাও পাওয়া যায়, ময়দাও পাওয়া যায়, সব জিনিসই পাওয়া যায়। একটা জায়গায় একজনকেই আশ্রয় নেবে। অথচ যেটা আমার দরকার সেটাই পাবো। আগে তা ছিল না—আগে যেটা দরকার যার কাছ থেকে পাবো তার কাছ থেকে সেটা নেবো। যার কাছে পাবে তার কাছে যাবে। আর ওটা হলো যে, এমন একটা জিনিস আছে যেখানে সব পাওয়া যায়।

সেই যদি সর্বাত্মক ভাবে তাকে ধারণা করতে পারো তাহলে আর দশ জায়গা যাবারই দরকার করে না। আমি হিন্দী পড়তে চাই সেও তুমি পড়াতে পারো, উর্দু পড়তে চাই সেও তুমি পড়াতে পারো, ফারসী পড়তে চাই সেও তুমি পড়াতে পারো, গ্রীকও পড়াতে পারো, ল্যাটিনও পড়াতে পারো, আমাকে ইংলিশও পড়াতে পারো—কাজেই আমি আলাদা মাস্টার করি কেন? এক জায়গাতেই তো সব কাজ আমার হয়ে যাবে। দরকার যদি হয়, আর যদি এক জায়গায় না থাকে, তাহলে পরে ছোটাছুটি করতে হয়। প্রপন্নের advantageটা কি? নিষ্ঠাটা বাড়ে তখন। দশ জায়গাতে গেলে নিষ্ঠা থাকে না তো। কেননা ওকেও গুরু বলে মানবো, ওকেও গুরু বলে মানবো, ওকেও গুরু বলে মানবো—গুরুর conflict এসে গেলেই তুমি বিপদে পড়বে। তোমার পক্ষে যা কর্তব্য অথচ এটাও কর্তব্য, ওটাও কর্তব্য, সেটাও কর্তব্য; তুমি কি করবে তাহলে? এটা গুরুবাক্য

কর্তব্য, ওটাও গুরুবাক্য কর্তব্য। কিন্তু যখন একটার মধ্যেই সব জিনিস আছে তখন দেখবার কোন দরকার নেই, যে যেটা বলবে সেটাই করবে—সব জিনিস তার কাছে আছে, সব কিছু দেওয়া যায়, এমন বস্তুও তার কাছে আছে—তখন কি হলো? 'বহুনাম্ জন্মজন্মনামন্তে' তখন জ্ঞান আসে। জ্ঞান আসলে 'মাং প্রপদ্যতে'—আমাতে প্রপন্ন হয়, কিনা, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'। বাসুদেব বাসুদেবকে নিয়ে বলেছেন তাই বাসুদেব, তুমি যে কোন দেবতাকে নিয়ে তা বলতে পারো। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি—' বাসুদেবই সব কিছু। এই হল শরণাগতি। বাসুদেব মানে এখানে আমার ইষ্ট আর কি। তাকেই ধরো তুমি—তার মধ্যেই সব আছে। আর একজনের কাছে আমার যাবার দরকার কি আছে, প্রকৃত গুরুই হচ্ছে সে, তার মধ্যে সব জিনিস থাকবে, সেইরকম 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'। সে লোকটি কি হবে—সে হবে প্রপন্ন। পাঁচ জায়গায় ঘুরে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করবে তা নয়, বাসুদেবই সব। এইটা সে বুঝতে পেরেছে। এইরকম ভাবে শরণাগতি। যে কালীকে ধরেছে—কালীর মধ্যেই সব আছে, এইভাবে। যে কোন দেবতাকে বা যে কোন ভাবকেই ধরুক একের মধ্যেই অনন্ত আছে।

One-এর মধ্যে infiinity আছে—একের মধ্যে অনন্ত আছে—এইটাই আসল তত্ত্ব বা principle—একের মধ্যে সব কিছু আছে—আর ওটা তো তা নয়, একের মধ্যে এক আছে, দুইয়ের মধ্যে দুই আছে, তিনের মধ্যে তিন আছে—এইরকম। আর এখানে হচ্ছে একের মধ্যে একও আছে, দুইও আছে, তিনও আছে, চারও আছে, সব আছে। একের মধ্যে সব কিছু আছে, এটার নাম প্রপত্তি। তখন 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'। তখন সব কিছুই তিনি। এইরকম যে মহাত্মা তাঁকে পাওয়া বড় কঠিন।

তাহলে দেখো যে শরণাগত হবে, শরণাগত হওয়ায় সঙ্গেও কতকগুলো condition আছে। তা না হলে তার ভেতরে ভুল থেকে যাবে। একদিকে শরণাগত আর একদিকে শরণাগত না হওয়ার জন্য যে অভাব রয়ে গেল। কাজেই এখন এইটাই হলো আমরা দুটো দিক পেলাম (১) বাসুদেব সর্বমিতি—(২) তার উপরে নির্ভর করো।

One-sided যদি কেউ হয়; একটা side সে পেয়ে যাবে, যদি দ্বিতীয় কোন side-এর যদি খুলে যায়, তবে সেই sideটা সে পেয়ে যাবে। তৃতীয় side যদি খোলা থাকে, তবে সে, সেই sideটা পেয়ে যাবে।

কিন্তু সবগুলিই তুমি পেয়ে যাবে, তোমার প্রয়োজনানুসারে, এ হয় না। সেটা হয় কখন? যার ভিতরে সবটা খুলে যায়; যার ভিতরে সেইটা আছে,

সেই হচ্ছে বাসুদেব। তোমার যেমনটা অভাব হবে আমি পূরণ করে দেবো। ভয়ের কি আছে? দুঃখ, চিন্তা কিছু করো না। এই হচ্ছে জ্ঞান।

জ্ঞানটা আগে হল না শরণাগতিটা আগে হল? আগে সেই জ্ঞানটা আসছে, জ্ঞানটা যদি না আসে, শরণাগতিটা কোথা থেকে আসবে? অথচ জ্ঞানটা হল বড় জিনিস—এখানে যে জ্ঞানটা উপায় is a means to an end. অন্য জায়গাতে জ্ঞান উপেয় is an end in itself. Difference কতখানি? না এই হচ্ছে difference—কাজেই ভক্তি যেখানে শরণাগতিতে পরিণত হয় সেখানেতে জ্ঞানের প্রাধান্য থাকতে পারে না, জ্ঞান সেখানে আসবে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানই আসবে সেখানে। জ্ঞানটা কিসের জন্য দরকার? জ্ঞান পাওয়ার জন্য জ্ঞানটা নয়, জ্ঞানটা এইজন্য যে আমি আমার যোগ্যতা, যেমন আমার হাঁটায় যেমন তেমন ভাবে ফুটে উঠবে আলাদা করে দশ জায়গায় যেতে হবে না। একটা জিনিস করার জন্য, একখানা চিঠি লিখবো, কলমটার জন্য একজনের কাছে যাবো, কালিটার জন্য আরেকজনের কাছে যাবো, যার কাছে কলম আছে, তার কাছে কাগজ নেই, যার কাছে কালি আছে তার কাছে কলম নেই, কিছুই নেই। এ এক এমনজন যার কাছে সবই আছে—কাজেই চিঠি লিখতে হলে যা যা দরকার হয়, তা একজনের কাছেই পাওয়া যাবে—এইরকম ভাবটা জ্ঞান অবস্থা—তারপরে আসছে শরণাগতি—পরের অবস্থাটা। জ্ঞানটা হ'ল earlier পূর্বের অবস্থা—আর শরণাগতি পরের অবস্থা। সাধারণভাবে, জ্ঞানটাই বড়, শরণাগতি বলে কোন জিনিসই নেই। জ্ঞানটা earlier stage, একের মধ্যে নিয়ে শরণাগতিতে merge হয়ে যায়। এইজন্য নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে সেই তার ভেতরে সেইভাবে পেয়ে যায়, তাঁর মধ্যে সেই জিনিসটা সেইভাবে ফুটে উঠে, কিন্তু পায় সে একের মধ্যে—সকলই সে একের মধ্যে থেকে পায়। তখন সে জ্ঞানটা হয়ে যায়—means to an end. জ্ঞানটা পেয়েছে বলে জ্ঞানী হয়েছে, শ্রেষ্ঠ হয়েছে, 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং...অর্জুন'। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'—ভক্ত চার রকম আছে—গীতায় বলেছেন না? এই কি রকম আর্ত? যে অনেক দুঃখ, কষ্ট পেয়ে আমাকে ডাকছে—এই একরকমের ভক্ত। জিজ্ঞাসু—যার জ্ঞান হয়নি, কিন্তু জ্ঞান পাওয়ার জন্যে সে ছটফট্ করছে। অর্থার্থী—যে জাগতিক কোন অভাব দূর করার জন্য ডাকছে, অর্থ মানে টাকা পয়সা চায় তা না, যে কোন জিনিস তার কাছে প্রয়োজন, তার জন্য সে ডাকছে। আর যার পরমার্থ ছাড়া আর কোন অর্থই নেই সে হলো জ্ঞানী। তাহলে সে আর্ত নয়, জিজ্ঞাসু নয়, অর্থার্থীও নয়, সে হলো কে?—

জ্ঞানী। জ্ঞানীই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ। এ তো এক জন্ম নয়, বহুজন্মের। তারপর যে জ্ঞান আসে—জ্ঞান আসলে অন্য জায়গায় যাবার দরকার নেই, কিসের জন্য যাবো সেখানে? তখন হল জ্ঞানী ভক্ত। সে ভক্ত—কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত। আবার যে ভক্তের জ্ঞানের উদয় হয়নি, আগে ভক্ত হয়েছে, সে অজ্ঞানী ভক্ত। কাজেই জ্ঞানী ভক্ত সে-ই যে সর্বকিছু অর্পণ করেছে এবং শরণাগতি ভাবটা এসে গেছে—সেটা হল শরণাগতি। আসল কথা।

গতি-স্থিতি

প্রশ্ন ঃ গতি আর স্থিতি ভালো করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ গতি অর্থাৎ প্রয়াণকালের গতি। মৃত্যুকালের অনন্তর গতি শাস্ত্রে যা পাওয়া যায় তা দুই রকমের ঃ একটি হচ্ছে দেবযান গতি, আর একটি হচ্ছে পিতৃযান গতি। পিতৃযান গতি যেটা, সেটা চন্দ্রলোক পর্যন্ত যায়। ঐখানে ভোগাদি শেষ ক'রে তা'কে ফিরে আসতে হয় বলে সে গতিটা হচ্ছে বক্রগতি। দেবযান গতি সূর্যমণ্ডলের দিকে যায়। সূর্যমণ্ডল ভেদ ক'রে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি হয়, সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় না। এটা বক্রগতি নয়, সরলগতি। গতির দিক থেকে দেখতে গেলে এই দুইটি গতি আমাদের শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

পিতৃযান গতি অর্থাৎ বক্রগতি হচ্ছে যাদের পুনর্বার জন্ম হয় তাদের জন্য। সেই গতিতে গিয়ে সেখানে স্থায়ী হ'য়ে থাকে না—স্বর্গেই যাক্ বা লোক-লোকান্তরেই যাক্, ঘুরে ফিরে আবার নরদেহ ধারণ করতে হয়, আবার কর্মপথে অগ্রসর হ'তে হয়। এই গতি সব সময় বেঁকে গিয়েছে অর্থাৎ উপর দিকে গিয়েছে বটে কিন্তু আবার ফিরে আসে। দেবযান গতি জ্ঞানের সঙ্গে যোগ না থাকলে হয় না। একেবারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা বলছি না, তা হ'লেও জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের যোগ ভিন্ন, জ্ঞান-কর্ম উভয়ের সমুচ্চয় যদি না থাকে, তা'হলে দেবযান গতি হয় না। ভক্তরা, বিশেষতঃ ভক্তিসম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ আচার্য যাঁরা, তাঁরা এই দেবযান গতির কথা বিশেষভাবে বলেছেন এবং মৃত্যুসময়ে যে উৎক্রমণ হয় তারও বিশেষ বর্ণনা করেছেন।

এই উৎক্রমণের একটা মার্গ আছে—এই মার্গটা হচ্ছে সুষুম্না মার্গ। আমাদের দেহের ভিতরে যেমন সুষুম্না নাড়ী চলে গিয়েছে, তেমনি দেহের বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়েও সেই সুষুম্না নাড়ী চলে গিয়েছে। সুষুম্না হ'চ্ছে সূর্যরশ্মির একটি নাড়ী বা রশ্মি। সূর্যের সরল রশ্মি যেটি সেটিই হচ্ছে সুষুম্না নাড়ী। আমাদের দেহের মৃত্যুকালে যদি নাকি জীব এই নাড়ীকে আশ্রয় করে উর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে, তাহলে দেহত্যাগ ক'রে এই নাড়ীকে আশ্রয় ক'রে সূর্যমণ্ডল ভেদ ক'রে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এই গতিই হচ্ছে দেবযান গতি এবং এই গতিতে পুনরাবর্তন হয় না।

এমন একটা অবস্থা আছে যে অবস্থাতে ঊর্ধ্বগতিও থাকে না, সেটাই হচ্ছে গতিহীন স্থিতির অবস্থা। সেটা সকলের হয় না। যাদের ঊর্ধ্বগতি হ'বার কথা, তা'দের ঊর্ধ্বগতি হয় এবং ঊর্ধ্বগতি হ'য়ে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের স্বরূপেতে যোগ সিদ্ধ হয়। ভক্ত, যোগী প্রভৃতি এইরকম গতি পেয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের যদি পূর্ণ বিকাশ হয়, এমন সিদ্ধান্তও আছে যে সেই বিকাশের ফলে গতি আবশ্যকই হয় না। গতি মানেই বুঝতে হবে সে যেখানে আছে সেখান থেকে একটা উৎকৃষ্ট স্থান আছে এবং এই গতিকে আশ্রয় করে নিকৃষ্ট স্থান থেকে বেরিয়ে উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে নিত্যকাল সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে থাকে—গতি যাঁরা মানেন এটাই তাঁদের সিদ্ধান্ত যে যাওয়া আছে, ফিরে আসাটা নেই। 'যদ্ গত্বা ন পুনরাবর্তন্তে'—এই হ'ল ভাবটা তার। চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নির যে অতীত অবস্থা আছে, এই ধাম যদি কেউ প্রাপ্ত হয় এই ঊর্ধ্বগতির দ্বারা, তা' হ'লে আর পুনরাবর্তন হয় না।

কিন্তু এমন অবস্থাও আছে যে-অবস্থায় যাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। একটা হ'ল, গেল কিন্তু ফিরল না ; আর একটা হ'ল, গেল আবার ফিরে এল। আর একটা হ'ল, যাওয়াও নেই আর ফিরে আসার প্রশ্নও নেই। যায় আবার ফিরে আসে, এটা হ'ল পিতৃযানের কথা—নরদেহ থেকেই যায় আবার নরদেহেই ফিরে আসে, কেননা নরদেহই হচ্ছে কর্মের অধিকারী এবং সেই কর্মের ফলে এই গতিগুলো হয়। সুতরাং সে ঊর্ধ্বলোকেও যদি যায়, অধোলোকেও যদি যায়, সেখানে গিয়ে আটকে পড়ে থাকে না ; আবার ফিরে আসে নরদেহে, আবার নতুন করে কর্ম করে, আবার মৃত্যুর সময়েতে কর্মানুরূপ গতি হয়। ওই হ'ল যাওয়া এবং আসা।

আর একটা গতি আছে—গেল বটে এই নরদেহ থেকে এবং এমন রাস্তা দিয়ে গেল যে-রাস্তা দিয়ে গেলে যাওয়াটাই হ'ল কিন্তু তা'কে আর ফিরতে হয় না। "যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—এটা হল সেই ভাবের কথা। সেটা কোন্ সময় হয় ? সেটা কি শুদ্ধ কর্মের দ্বারা হয় ? না, শুদ্ধ কর্মের দ্বারা হয় না। তবে কি শুদ্ধ বিশুদ্ধতম জ্ঞানেতে হয় ? না, বিশুদ্ধতম জ্ঞানেতে কোনো গতিই থাকে না। তবে কোন্ অবস্থা ? উপাসকদের জন্য সে-অবস্থা। ব্রহ্ম-উপাসনা ক'রে ঊর্ধ্বগতি যাঁরা লাভ করেন তাঁরা আর ফেরেন না। সেখানে যাবার ফলেতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'ন এবং যুক্ত হ'লে আর ফিরে আসেন না। আর ফিরে আসার কোন প্রশ্ন থাকে না। ফিরে আসবেন কেন ? কর্ম তো তাঁর নেই, যে ফিরে আসবেন। প্রশ্ন হতে পারে :

কর্ম তো নেই, তা' হ'লে যান কি ক'রে ? যখন যান তখন তো একটু কর্ম ছিল—জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয় কিনা, একটু কর্ম ছিল সেখানেতে। কাজেই সেই উপাসনার ফলেতে ঊর্ধ্বগতিটা হয়। তার ফলেতে পরম ধামেও স্থিত হ'ন।

আর যদি এই দেহে থাকতেই কর্মের সম্পূর্ণ বিলোপ হ'য়ে থাকে, যদি কর্মের লেশ পর্যন্ত না থাকে, যদি সেটা সম্ভবপর হয়—কোনো কোনো মতে সম্ভবপর—সে-স্থলে গতিই বা থাকবে কেন ? ঊর্ধ্বগতির প্রশ্ন নেই—ফিরে আসার তো প্রশ্নই নেই, কেননা গেলে তো ফিরে আসবে। যে যেখানেই থাকুন না কেন, যে অবস্থাতেই স্বরূপে স্থিত হয়ে যাবে। স্বরূপটা সব জায়গায় রয়েছে কিনা—স্বরূপটা তো এমন নয় যে অন্যখানে গিয়ে তবে স্বরূপ লাভ করতে হ'বে। কাজেই সেখানেতে স্বরূপ লাভের জন্য কোনো জায়গায় যাবার প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন করতে পারো, যা'রা যায় তা'দের কি অপরাধ ? তারা তো এখানে স্বরূপটা পায় না এবং পায় না বলেই নিকৃষ্ট স্থান তা'দের ত্যাগ করতে হয় এবং উৎকৃষ্ট স্থানে গিয়ে স্থিত হয়। কিন্তু যারা এখানেই সেই পরম স্থিতি প্রাপ্ত হতে পারে—যদি এখানে বিশুদ্ধতম জ্ঞান তাদের হয়ে যায়, তবে সে যাবে কোথায় ? আমি যাব যেখানে সেখানে উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের প্রশ্নই যেখানে নেই, ছোট-বড়োর প্রশ্নই যেখানে নেই, শুদ্ধ সব বস্তু, শুদ্ধ ব্রহ্ম যে সমভাবে সর্বত্র বিরাজমান বা বর্তমান রয়েছেন—এই জ্ঞানের যদি প্রকাশ হয়ে যায়, তা'হলে সে যাবে কোথায় ? যাবার তো কোন জায়গা নেই। কাজেই তা'র জন্য গতির কোনো দরকার হয় না।

তা' হ'লে তিন প্রকারের অবস্থা হচ্ছে ঃ (১) যাওয়া এবং আসা (২) যাওয়া আছে, আসা নেই, আর (৩) যাওয়াও নেই আসাও নেই। এই হ'ল গতি-স্থিতির ব্যাপার।

লোক-লোকান্তর ও ব্যাহৃতিতত্ত্ব

প্রশ্ন ঃ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—এই তিনটি ব্যাহৃতির তত্ত্ব একটু ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ হচ্ছে তিনটি ব্যাহৃতি। এই তিনটি ব্যাহৃতিকে মহাব্যাহৃতি বলা হয়। মহাব্যাহৃতিও যা, ক্ষুদ্র ব্যাহৃতিও তাই। যখন খণ্ড ব্যাহৃতিরূপে দেখা হয় তখন সাতটা ব্যাহৃতি ঃ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সাতটি আছে। খণ্ড ব্যাহৃতিরূপে সাতটা ব্যাহৃতি আর মহাব্যাহৃতিরূপে তিনটি ব্যাহৃতি। এর মধ্যে যেটাকে স্বঃ বলা হ'ল এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে বুঝতে হবে ঃ একটা হচ্ছে অশুদ্ধভাব, আর একটা হচ্ছে শুদ্ধ ভাব। অশুদ্ধভাব যেটা সেটা হচ্ছে স্বর্গ। যেটাকে দ্বিতীয় স্বর্গ বলে। ইন্দ্রলোক প্রভৃতি বলে সেটাই স্বঃ, সেটা অশুদ্ধ। যদিও সেটা আনন্দময় স্থান বটে, যদিও সেটা ভোগের স্থান বটে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং যারা পুণ্যবান্ এবং সুকৃতিমান্ তারা সেই স্থানে গমন করে। এ সবই সত্য। তা' হলেও তার মধ্যে অজ্ঞানের বীজ থাকে, অজ্ঞান ভাবটা থাকে, কর্মবীজ থাকে এবং কর্মবশে অর্থাৎ কর্মানুসারে সেখানে গতি হয়, এ কথা মনে রাখতে হবে।

আর একটা দিক আছে, যার মধ্যে অজ্ঞান থাকলেও জ্ঞানের সম্বন্ধটা আরম্ভ হয়ে যায়। এই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ অনুসারে সেই স্তরের একটা মহঃ, একটা জনঃ, একটা তপঃ, একটা সত্য। সত্যের মধ্যে জ্ঞানটা খুব প্রবল থাকে। অজ্ঞানটা থাকে না তা নয়, বিন্দুমাত্র থাকে, কর্মের সামান্য লেশ থাকে, আর কিছু নয়—এটাকে সাধারণতঃ বলে ব্রহ্মলোক। আমরা যা'কে সত্যলোক বলি, ব্রহ্মলোক তারই নাম। এক এক স্থানে এক এক ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু যখন এই লেশটুকুও থাকে না, তখন সে লোকসংস্থানের বাইরে চলে যায়। তখন আর লোকসংস্থান থাকে না, কেননা কর্মের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ না থাকলে কোন লোক হতে পারে না। যে কোন লোকই হোক না কেন, সমস্ত লোকই হয় সুখভোগের জন্য, না হয় দুঃখভোগের জন্য অথবা একটা সুখ-দুঃখের মিশ্র অবস্থা আছে, নানাপ্রকারের, সেইটা ভোগের জন্য।

কিন্তু যে সময় বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়ে গেল, তখন সুখদুঃখের অতীত হ'য়ে গেল কিনা, তাই তখন যে আনন্দ সেটা কর্মফলপ্রসূত নয়। সে আনন্দটা

হ'চ্ছে স্বরূপানন্দ—আত্মার স্বরূপস্থিতির থেকে যে আনন্দের বিকাশ হয় সেই আনন্দ সেটা, ব্রহ্মানন্দ সেটা—সেটা কোনো ভোগের অন্তর্গত নয়—এ কথাটা সব সময় মনে রাখতে হ'বে। এজন্য আমরা অনেকসময় ব্রহ্মলোককে আগম-অপায়শীল এটাও পাই, পুনরাবর্তনশীল এটাও পাই, আবার ব্রহ্ম-লোকে পুনরাবর্তন নেই, এরকম বর্ণনাও আছে। কেউ ঊর্ধ্ব ব্রহ্মলোক বলে, কেউ অধো ব্রহ্মলোক বলে—নানাভাবে নির্দেশ করে। কাজেই যখন নাকি কর্ম বা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বীজ একটুও না থাকে, সেটা লোকস্থিতির মতো নয়, সেটাই স্বরূপ। সেখানে পুনরাগমনের বীজ থাকে না। আর যেখানে একটু সামান্য থাকে, সেখানে পুনরাবর্তনের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু পুনরাগমন সব সময় হয়, তা' নয়। তা'র কারণ সেখান থেকে সেটা কেটেও যেতে পারে। যখন কেটে যায় তখন পরব্রহ্মে স্থিতি হয়ে যায়, তখন আর পুনরাবর্তনের কোনো যোগাযোগ থাকে না, সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য যারা আছে ব্রহ্মলোকে, যা'রা নাকি সেই হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে থাকে, সেই যুক্ত অবস্থার বিভিন্ন বিভিন্ন স্তর আছে, ক্রম আছে। তারা সেখানে থাকে, সেখানে উপাসনা করে, আনন্দ উপভোগ করে এবং তারা সকলেই জ্ঞানী। কিন্তু জ্ঞানী হ'লেও জ্ঞান হয়েছে, তা' বলা যায় না।

সেটা কখন হয়? কোন্ সময় হয়? সেই যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনি তাঁর কার্যভার ত্যাগ ক'রে পরম কারণস্বরূপে যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ন্ তখন সে অবস্থাটা হয়। সেই সময় সমস্ত ব্রহ্মলোক তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যায় অর্থাৎ যে সব জ্ঞানী তাঁর সঙ্গে ছিলেন পার্ষদরূপে, তাঁরা সবাই মুক্ত হ'য়ে যান, পরমগতি লাভ করেন।

আমরা সপ্তলোক যখন বলি, এই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সাতটা বুঝতে হ'বে। আর একটা জিনিষ বুঝতে হ'বে—আমরা সাধা-রণতঃ তিনটা ভাগ করি ঃ অধোলোক, ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক। এইভাবে যদি বিচার করা যায়, তা' হ'লে দেখা যাবে মধ্যলোক যে জিনিষটাকে বলি সেটাই হচ্ছে ভূঃ, সেটা বিশ্বের centre-এ আছে। যেটা বিশ্বের centre-এ আছে সেটা হচ্ছে মধ্যলোক। এই যে মধ্যলোক, তাকে আশ্রয় ক'রে কত লোক রয়েছে। এই মধ্যলোককে আশ্রয় ক'রে ঊর্ধ্বলোকও রয়েছে (কামরূপ সংহিতাতে আছে)।

অধোলোক বলতে কি বুঝব? পাতাল—সপ্ত পাতাল সাধারণতঃ বলা হয়। কিন্তু পাতালের সংখ্যা অসংখ্য—সবই তো অসংখ্য। অনন্তের সৃষ্টিতে সবই অনন্ত। কাজেই পাতালও অনন্ত রকমের। তা' হ'লেও মোটামুটি

সপ্তভাগে বিভাগ ক'রে সপ্ত পাতাল বলা হয়। পাতাল, তল, বিতল, রসাতল ইত্যাদি করে বিভিন্ন ভাগ আছে। তেমনি পাতালের অধোদেশে আছে নরক। এই নরকের সাধারণতঃ তিনটে ভাগ করা হয়। এই তিনটে ভাগের ভিতরে আবার বত্রিশটা ভাগ আছে। তারপরও অসংখ্য ভাগ আছে অসংখ্য প্রকারের। এই যে সমস্ত নরক, এই নরকেরও নীচে, নরকের চরম অবস্থা—সেটা হচ্ছে অবীচি—অন্ধতমসাচ্ছন্ন, সেখানে বিন্দুমাত্রও সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না। এতে বুঝা যায়, সূর্যের কিরণ অন্তরিক্ষে প্রবেশ করে, সূর্যের কিরণ ভূলোকে প্রবেশ করে, সূর্যের কিরণ পাতালেও প্রবেশ করে, অপেক্ষাকৃত কমরূপে, তা' হ'লেও প্রবেশ করে, আর নরকেও অতি সামান্যভাবে প্রবেশ করে কিন্তু অবীচিতে সূর্যকিরণের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্যই 'অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ' এই সব বলা হয়। সেই যে অবীচি—বীচি শব্দের মানে তরঙ্গ—অবীচি মানে যেখানে তরঙ্গ নেই। সৃষ্টির যে স্পন্দ, সেটা সেখানে বুঝতে পারা যায় না। ঘোর অন্ধকারময় সে জায়গাটা। শুধু যে অন্ধকার তা' নয়, জ্ঞানের প্রকাশের দিক দিয়ে অন্ধকার, ঘোর তমোময়। তারও নীচের যে অবস্থাটা সেখানে হ'চ্ছে কাল—যে কালের দিক থেকে সৃষ্টি হয় সেই যে কাল তা'র স্থান হ'চ্ছে সেখানে। কালাগ্নিরুদ্র বলে, এই সেই স্থান। এর পরে আর বিশ্ব নাই। এখানেই বিশ্ব শেষ হয়ে গেল।

আর ঊর্ধ্বদিকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। সত্যলোকের ভিতরে অনেকে বিভাগ করেন—যেমন ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, রুদ্রলোক—যে ভাবেই করুন না কেন তার শীর্ষে top-এ একেবারে মাথার উপরে যেমন ব্রহ্ম-রন্ধ্র, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মরন্ধ্র যেটা, সেটা যখন ভেদ হ'য়ে যায়, তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তখন তা'র অধিষ্ঠাতা থাকেন উপরে, যাকে বলে বীরভদ্র, চারিদিকে রুদ্রগণের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। চারদিক্ মানেই হচ্ছে আটদিক্। আটদিক্ মানেই হ'চ্ছে দশ দিক্। দশ দিক্ হচ্ছেন রুদ্র, আর মূল হচ্ছেন অধিষ্ঠাতা, একাদশ রুদ্র হ'চ্ছেন। এই এক একটি রুদ্রের সঙ্গে শত শত অনুচর আছে, এইজন্য শতরুদ্র বলে। এই শতরুদ্রের স্থান অর্থাৎ এক একটা দিকে দশজন, তারপরে দশজন, তারপরে দশজন—দশ দিকে দশ দশে একশো। আর অধিষ্ঠাতারূপে আছেন রুদ্র যিনি, তিনি সকলের উপরে। এই নিয়ে একাদশ রুদ্র সংখ্যার সমষ্টি হয়ে গেল।

স্বঃ হ'ল দুইরকম ঃ একরকমের স্বঃ, তা স্বর্গ বটে কিন্তু সে-স্বর্গের থেকে পুনরাগমন হয়, জগতে আবার ফিরে আসতে হয়, স্বর্গে দীর্ঘকাল থেকে, বাস করে, পুণ্যফল আনন্দ ভোগ ক'রে 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'।

পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে তো আর সেখানে থাকবার উপায় নেই, মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। তখন আবার জন্মাবার জন্য মর্ত্যলোকে আসে। আবার যদি পুণ্যকর্ম করতে পারে আবার স্বর্গে যাবে। যা'র যে-রকমের কর্ম, যখন যে-রকমের কর্ম হয় সেই পুণ্যের তারতম্য অনুসারে, সেই পুণ্যের প্রকৃতি-ভেদ অনুসারে কোন্ স্বর্গে তা'র স্থিতি হ'বে তা' determined হয়, নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত হয়। এ'রকম নরকেও।—অত্যন্ত উৎকট পাপ হলে নরকে গতি হয়, উৎকট পুণ্য হলে স্বর্গে গতি হয়। উৎকট পুণ্যের ফল এই মর্ত্যদেহে ভোগ হতে পারে না, কেননা অত্যন্ত বড় আনন্দ যদি এই জগতে আসে, মানুষ আনন্দ ভোগ করতে গিয়ে মরে যাবে। আবার অত্যন্ত যন্ত্রণা যদি হয় সে-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না এবং মরে যাবে, ভোগ হ'বে না সেটা। অথচ কর্মের ফল যদি ভোগ করতে হয়, তা'র জন্য উপযোগী স্থানও দরকার, উপযোগী দেহও দরকার। উৎকট পুণ্যের উপযোগী স্থান হচ্ছে স্বর্গাদি আবার উৎকট পাপেরও উপযোগী স্থান হচ্ছে নরকাদি। তবে পুণ্যের ফল যদি অত্যন্ত উৎকট হয় তা' হ'লে আরও ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে। এইরকম নরকেও তাই। যন্ত্রণা এত বেশী যে মানুষ তা কল্পনাই করতে পারবে না অথচ সে-যন্ত্রণা তা'কে ভোগ করতে হ'বে। এই যন্ত্রণা ভোগের উপযোগী দেহও তা'কে পেতে হবে এবং উপযোগী স্থানও পেতে হবে। এই সব নিয়ে হচ্ছে বিশ্ব।

কর্মভূমি হ'চ্ছে মধ্যেতে আর চারদিকে হ'চ্ছে ভোগভূমি। পুণ্যফল হোক, পাপফল হোক্ ভোগ করতে হয়। আর মিশ্রকর্ম যদি হয়, মানে উৎকট পুণ্যের ফল ভোগ হয়ে গেল, তার পরও কিঞ্চিৎ পুণ্য রয়েছে বা উৎকট পাপের ফল ভোগ হয়ে গেল, তার পরও কিঞ্চিৎ পাপ রয়েছে অর্থাৎ পাপ-পুণ্য মিশ্র রয়েছে তখন সে সব ভোগের জন্য আবার ফিরে আসে। মর্ত্য-লোকে ফিরে আসে, মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, আবার জন্ম নেয়, আবার কর্মভূমিতে কাজ করতে থাকে। এই হ্চ্ছে মোটামুটি কথা।

তা হ'লে এই যে ত্রিলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ,—এই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ বলতে বুঝায় কি? না, প্রথম ভূঃ, তার ঊর্ধ্বে ভুবঃলোক—একে বলে অন্ত-রীক্ষ লোক, যাতে নক্ষত্রমণ্ডলাদি আছে—তা'র ঊর্ধ্বে হচ্ছে দ্যুলোক, যা'কে আমরা স্বর্গ বলছি। এই স্বর্গের ঊর্ধ্বে মহলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—চারটেই হ'ল স্বর্গ, কেননা পুণ্যের ফলভোগ ও আনন্দলাভ সেখানে হয়। কিন্তু ভেদ হ'চ্ছে এই—আনন্দের ভোগ হয় স্বর্গে। দ্বিতীয় স্বর্গ যেটা তা'তে কিঞ্চিৎ কর্মের সম্বন্ধ থাকে, কর্ম ছাড়া তা' হয় না। আর ওখানে

যে আনন্দ হয় সেটাও কর্মের ফল বটে, তার সঙ্গে জ্ঞানও থাকে। ওখানে কর্ম ও অজ্ঞান আর এখানে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ রয়েছে। তা'হলে জ্ঞান ও কর্মের মিশ্রণ যদি হয়, তা'হলে ঊর্ধ্বগতি হয়—মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই চারটি লোকে গতি হয়। তা'র মধ্যে কর্ম তো থাকবেই, জ্ঞানের ক্রমবিকাশ যত বেশী হ'বে ততই মহঃ হ'বে, জন হবে, তপঃ হবে, সত্য হবে—ক্রমশঃ উত্তরোত্তর লাভ হ'বে। তারপর যখন অজ্ঞান বা খণ্ডজ্ঞান মোটেই থাকবে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান যখন হয়ে যাবে তখন লোকসংস্থানের বাইরে চলে যাবে, কোনো লোকের মধ্যে থাকবে না। কেননা, লোকেতে থাকতে হয় কর্মফল ভোগের জন্য। ঊর্ধ্বেতে যায় অতি উৎকৃষ্ট পুণ্যফল ভোগের জন্য। জ্ঞান এসে গিয়েছে বটে কিন্তু সে-জ্ঞান পূর্ণ নয়। তার সঙ্গে অজ্ঞান কিঞ্চিৎ মিশ্র আছে—এটা স্বীকার করতেই হয়।

এই যে গতি হয় এইসব লোকে, এই গতি হয় দু'রকমের। একটা হচ্ছে শুক্ল গতি, একটা হ'চ্ছে কৃষ্ণগতি। আমাদের শাস্ত্রে সাধারণতঃ যা বলা হয়, একটা দেবযান গতি আর একটা পিতৃযান গতি। পিতৃযান গতি যেটা হয়, সে গতিটা হ'চ্ছে মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোক পর্যন্ত সেই ধারাটা চলে। চন্দ্রলোক যাওয়া মানেই হ'চ্ছে স্বর্গনরকাদি সব কিছু। কেননা কর্মফল যেখানে যেখানে হয় সে সমস্ত জায়গা চন্দ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত। চন্দ্রের থেকে উপাদান এনে দেহ তৈয়ারী হয়, এটা সব সময় মনে রাখা উচিত। আমরা যাকে প্রেতলোক বলি, সেটা মাঝের অবস্থা। আমরা যাকে পিতৃলোক বলি সেই পিতৃলোকের অন্তর্গত স্বর্গাদি। অনন্ত প্রকার সংস্থান রয়েছে, সমস্ত পিতৃলোকের অধীন। পিতৃলোক দুইরকমের, দেবলোক দুইরকমের, একথা মনে রাখতে হ'বে। পিতৃলোক দুইরকম কিরকম ? এক নিত্য পিতৃলোক। যেমন অগ্নিষাত্তা প্রভৃতি। তর্পণের সময় যাঁদের উল্লেখ ক'রে জল দান করে তাঁরা নিত্য পিতা। আবার নৈমিত্তিক পিতা আছেন, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষ, যেমন ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের পূর্বপুরুষ। এ'রা নৈমিত্তিক পিতা। এই হ'ল দুইরকমের।

দেবতাদের মধ্যেও দুইরকমের দেবতা আছেন—একরকমের দেবতা আছেন তাঁরা হচ্ছেন কর্মদেবতা। আর একরকমের দেবতা আছেন, তাঁরা হচ্ছেন আজানদেবতা। কর্মদেবতা হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা নির্দিষ্ট কর্ম ক'রে ফলভোগের জন্য দিব্যদেহ লাভ করেন এবং দিব্যলোকে বাস করেন। তাঁরা চিরকাল সেখানে থাকেন না, কেননা কর্ম ক্ষয় হ'য়ে গেলে সেখানে তাঁদের থাকবার অধিকার থাকে না। যাঁরা আজানদেবতা, তাঁদের আবির্ভাবই হয় দেবকুলে, দেবভাবে।

দেবতাদেরও জন্ম হয়, তবে মাতৃগর্ভে নয়, তাঁদের অযোনিজ দেহ। দেহ দুই প্রকারের—এক হ'চ্ছে যোনিজ দেহ, আর এক হ'চ্ছে অযোনিজ দেহ। যোনিজ-দেহের অর্থই হ'চ্ছে পিতা ও মাতার শুক্র ও শোণিতে, পিতামাতার সংযোগে যে দেহ হয়। মাতৃগর্ভে প্রবেশ হয়, তারপর ভূমিষ্ঠ হয় এবং সুখদুঃখ ভোগ হয়, তা'র নাম যোনিজ দেহ। আর যে দেহ যোনিতে উৎপন্ন হয় না অথবা পিতা-মাতার রজ এবং বীর্যে হয় না সেটা হচ্ছে অযোনিজ দেহ। সূক্ষ্মভাবে পিতৃশক্তি মাতৃশক্তি সেখানেও থাকে কিন্তু স্থূলভাবে রজোবীর্যের সংযোগটা সেখানে থাকে না।

সুতরাং দেবতাদেরও জন্ম হয়। অনেক দেবতার জন্ম হয় শুধু দৃষ্টি দ্বারা। যে চেহারাটা সৃষ্টি হ'ল বা প্রকট হ'ল সেটা হয়তো হ'ল পাঁচ বছরের বা সাত বছরের। জন্ম হয়ে এক বছর এক বছর ক'রে বাড়ে তা হয় না। জন্ম যখন হল পাঁচ বছরেরই জন্ম হ'ল অথবা সাত বছরের জন্ম হ'ল অর্থাৎ পাঁচ বা সাত বছরের লোকের যেমন চেহারা তেমনি চেহারা। নিত্য যৌবন—এমন হয় যে প্রথমে তার বাল্যাবস্থা ছিল, পরে কিশোরত্ব প্রাপ্ত হয়ে যৌবনলাভ করেছে। কোনো কোনো সময়ে স্মৃতির দ্বারা একটায়—কখনও কখনও পুষ্পের থেকে উৎপন্ন হয়। এই যে আমাদের কবীর সাহেব, তাঁর কমল থেকে জন্ম হয়েছিল অনেকে বলে। রাধিকাকে যেমন বলা হয় কমলিনী। এর মধ্যে অনেক রহস্য আছে। সাধারণ লোকে তা বুঝতে পারে না। এ দেহ শুদ্ধ দেহ। সাধারণ লোকের যে দেহ হয় সেটা শুদ্ধ দেহ নয়, কেননা কামবৃত্তি থেকে সেটা উৎপন্ন হয়। কামবৃত্তি শব্দের অর্থ হচ্ছে পিতামাতার মধ্যে কামভাব না আসলে সে দেহ তৈয়ারই হয় না। এজন্য Christianরা বলে original sin. যে যত ভাল লোকই হোক্ না কেন, যখন মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হ'য়েছে তখন সে অজ্ঞানের মধ্য দিয়ে এসেছে, তখন সে sinful। আমরা অজ্ঞানের কাজ না করলেও, পাপ না করলেও আমরা যে এসেছি মাতৃগর্ভের মধ্য দিয়ে। তা'র মানেই হচ্ছে অজ্ঞানী। অজ্ঞান না হ'লে জগতে আসাই হয় না। অজ্ঞান যদি সরে যায় এ জগতে থাকাও যায় না। এটাই হ'চ্ছে sin—এটা গভীর রহস্যময়। অনেকে ঠাট্টা করে, কারণ তা'রা বুঝতে পারে না। ওদের sin আর আমাদের পাপ এক জিনিষ নয়। তবে মূল conceptionটা এ'রাও বলেছেন, ওঁরাও বলেছেন—প্রত্যেকেই আলাদা ভাবে প্রকাশ করেছেন।

এই যে লোকগুলো বললাম—পৃথিবী, পৃথিবীর পরে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের পরে স্বর্গ—এই যে তিনটি লোক—এই তিনটি লোক হচ্ছে আগম-

অপায়শীল, পরিবর্তনশীল, দ্রুত পরিবর্তন এর মধ্যে হয়। পিতৃযান গতিতে ঊর্ধ্বলোকে গতি হয় অথবা অধোলোকে—যেখানেই হোক্ কর্মফল ভোগ শেষ হয়ে গেলে আবার মনুষ্যলোকে ফিরে আসতে হয়—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।' পুণ্যফলেতেও যেরকম, পাপফলেতেও সেইরকম, পাপক্ষয় হ'লে আবার মনুষ্যদেহেতে নতুন কর্ম করতে হয়।

যেটা দেবযান গতি সেটা হচ্ছে অন্যরকম। দেবযান গতিতে সূর্যমণ্ডলে যায়। এটা যায় সূর্যে, সেটা যায় চন্দ্রে। তাই এটাকে বলা হয় শুক্লগতি। দেবযান গতি যেটা সেখানে অনেক middle station আছে, মধ্যবর্তী অবস্থান বা স্থিতি আছে। এ সব আমাদের উপনিষদের মধ্যে, বিভিন্ন পুরাণাদিতে অনেক আলোচনা আছে—এখানে সে খুঁটিনাটিতে ঢুকবার প্রয়োজন নেই। মোটামুটি সে গতিটা হচ্ছে সরলগতি, সেটাই সূর্যমণ্ডল ভেদ করে। পিতৃযান গতিটা সরল গতি নয়, বক্রগতি—যায় সোজা, তারপর গিয়ে মর্ত্যলোকেতে ফিরে আসে। দেবযান গতি সূর্যমণ্ডল ভেদ করে। সূর্যমণ্ডল ভেদ না করলে পরব্রহ্মে যাওয়া যায় না।

আগেই বলেছি পূর্বে আলোচনার সময়, পরব্রহ্ম প্রাপ্তি দুই প্রকারে হয়—একটা প্রকার হ'চ্ছে গতি, আর একটি প্রকার হ'চ্ছে স্থিতি। গতির পরেতে স্থিতি, এই একরকমের আছে, আর গতি অবলম্বন না ক'রেই স্থিতি। যেখানে কিঞ্চিৎ কর্মের সম্বন্ধ আছে সেখানে গতি হয়। কৃষ্ণগতি—শুক্লগতি যেটা বললাম সেটা, বা গীতাতেও মরণের সময়ের যে-বর্ণনা আছে 'পরাং গতিম্' যেটা, যেটা উৎক্রমণ—সবই এই গতিরই অন্তর্গত। এই উৎক্রমণ যখন হয় যোগী বা জ্ঞানী বা মহাপুরুষের অথবা সাধারণ মানুষের উপর মহাপুরুষের কৃপা যদি হয়, তখন এই দেহের থেকে সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি হয়।

সুষুম্না নাড়ী যেটাকে আমরা বলি সেটা হ'চ্ছে সূর্যরশ্মি। সূর্যের রশ্মিই ওটা, সরল রশ্মি। সূর্যের অনন্ত রশ্মি আছে। তার মধ্যে যেটা সরল রশ্মি তার নাম হ'চ্ছে সুষুম্না। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে সেটা রয়েছে। সেটা জীবের মধ্যেও আছে কিন্তু বক্রভাবাপন্ন ব'লে সুষুম্না নয়। সুষুম্না রশ্মি ধরেই বড় বড় যোগী যাঁরা, তাঁরা মূলাধার থেকে, মূল অজ্ঞানভূমি থেকে জাগ্রত হ'য়ে, উন্মেষপ্রাপ্ত হ'য়ে ক্রমশঃ উপর দিকে ওঠেন, মহাশূন্য ভেদ করেন, মহাশূন্য ভেদ ক'রে চিদাকাশে গিয়ে পরম ধারা যেটা সেখানে যুক্ত হয়ে যান। সুতরাং সুষুম্না গতি ধরে যদি যান্ তাঁদের ঊর্ধ্বগতি হয় অর্থাৎ তাঁরা আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচক্র ভেদ ক'রে দেহের বাহিরে সূর্যরশ্মি

ধরে ক্রমশঃ এগিয়ে যান এবং বিভিন্ন স্টেশন বা অবস্থান বা স্থিতি আছে, সেগুলো ভেদ ক'রে যান। বিভিন্ন গ্রন্থে তা'র বর্ণনা আছে। গীতাতেও কিঞ্চিৎ আভাস আছে। তারপর সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলেই তা'র যে ময়লামাটি, বাসনা, সংস্কার সব দগ্ধ হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে সূর্যমণ্ডল ভেদ ক'রে ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করেন। এই ব্রহ্মস্বরূপটাই তাঁর পরম গতি। এর পরে যা'কে পুরুষোত্তম বলে, সেই পুরুষোত্তম অবস্থা প্রাপ্তি হয় এবং নিজের স্বরূপ তাঁর সঙ্গে অভেদভাবে অনুভব করেন। সেখানে তাঁর সমস্ত কামনা-বাসনা বিসর্জন হ'য়ে যায় এবং পরম শান্তিময় পরম স্থিতি লাভ করেন। এই হ'ল দেবযান গতির ফল।

আর একটা অবস্থা আছে, যেটা গতি নয়, স্থিতি। জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় যদি না হয় অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় যদি না থাকে, তা' হ'লে গতি হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞান যদি হয়, যে জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের যোগ নেই এমন জ্ঞান যদি তা'র হয় তা' হ'লে সে যেখানে আছে সেখানেই পূর্ণত্ব পেয়ে যায়, তার পূর্ণত্ব খুলে যায়। পূর্ণত্ব গিয়ে পাবে এমন তো কথা নয়, প্রত্যেক জায়গাতেই পূর্ণত্ব আছে, অখণ্ড সত্তা আছে। অখণ্ড সত্তাকে পায় না বলে, স্থিতি হয় না ব'লে তখন কর্মের প্রভাবে অথচ জ্ঞান রয়েছে এমন অবস্থায় বিকাশক্রমে ঊর্ধ্বগতি লাভ হয়, ঊর্ধ্বদিকে গতি হয়। ঊর্ধ্বদিকে যেতে যেতে এমন একটা অবস্থা হয় যেখানে জ্ঞানই জ্ঞান, কর্ম থাকে না, সেখানে আবার লোক কোথায় ? বিশ্বই বা কোথায়, জগৎই বা কোথায়, বৈচিত্র্যই বা কোথায় ? তখন সে অখণ্ড সত্তাই পেয়ে গেল, তাছাড়া তো আর কিছুই নয়। কেউ যদি এরূপ ভাগ্যবান হয় তা' হ'লে সে যেখানে আছে সেখান থেকেই সেই স্থিতিটা লাভ করতে পারে। তার অন্যত্র যাবার দরকার হয় না।

এইজন্য আমাদের বেদান্তাদি শাস্ত্রে বা বৈষ্ণব দর্শন, শৈব দর্শন এবং অন্যান্য বিভিন্ন দর্শনে যে উৎক্রান্তি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা, তা'তে দুইটি মত পাওয়া যায়। একটা মত হচ্ছে জ্ঞানী বা ভক্ত প্রভৃতির উৎক্রমণ, আর একটি মত হ'চ্ছে উৎক্রমণ তাঁরা স্বীকারই করেন না। দুইটি মতের কোনোটি যে ভুল তা' নয়। এটাও সত্য, ওটাও সত্য। উৎক্রমণ হয় যখন তখন একটা ঊর্ধ্বগতি হয় এবং ঊর্ধ্বগতির ফলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়—'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম' সেই ধাম প্রাপ্তি হয় সেই অবস্থাতে। আর যাদের গতিই হয় না, তা'দের ধামের কোনো প্রশ্নই নেই। তাদের নিজের স্বরূপটাই তো ধাম। যে যেখানে থাকে সেখানেই তা'র স্বরূপটা খুলে যায়,

অখণ্ড প্রকাশটা খুলে গেল। বিশুদ্ধ হ'লে এটা হয়। আর বিশুদ্ধ জ্ঞান না হলে কিঞ্চিৎ কর্মের যোগ থাকলে উৎক্রমণ হয়।

তা' হ'লে মোটামুটিভাবে আমরা ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটি জিনিষ পেলাম। কিন্তু শাস্ত্রমতে অনেক কথা বলবার আছে। কঠোপনিষদে যে নচিকেতার উপাখ্যান আছে তা'তে স্বর্গ সম্বন্ধে বলা আছে, সেটা সম্বন্ধে এখন বলা যাবে না, অন্য কোনো সময়ে দরকার হ'লে বলব। স্বর্গ বললে পৌরাণিক স্বর্গ নয়। স্বর্গ হ'চ্ছে নিত্য চিদানন্দময় ধাম, স্বরূপধাম যেটা। যাক্—মোটামুটি লোকসংস্থান আলোচনা করতে গেলে এই তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—একটা হ'চ্ছে ভূঃ, যেখানে আমরা আছি, আর একটা হ'চ্ছে স্বঃ, যেটা আমাদের প্রাপ্য আনন্দময় স্থান, আর মাঝামাঝি যেটা সেটা হচ্ছে অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষ মানে ভিতরে থেকে যেটা ঈক্ষণ হয়—ভিতরে আছেন দেখতে পাচ্ছে—দুটোর মাঝখানেতে যেটা আছে, সেটাই অন্তরীক্ষ। এই হ'ল ত্রিলোক, এই ত্রিলোকের মধ্যেই সপ্তলোক আছে। স্বর্গটা যখন নাকি শুদ্ধ জ্ঞানময়, তার সঙ্গে কর্মের অতি সামান্য সম্বন্ধ মাত্র আছে, এইরকম ভাব নিয়ে যখন আমরা দেখব তখন উপাদানগত সত্ত্ব আর সেটা যদি না থাকে, অজ্ঞান রয়েছে অথচ পুণ্যও রয়েছে, তারপর যে, সেটাও তো সত্ত্ব। তা'হ'লে তৃতীয় স্বঃ এক, আর চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম নিয়ে হ'ল এক—এই দু'টো বিভাগ হ'ল। চতুর্থ যেটা হ'ল সেটা হ'ল বিশুদ্ধ স্বর্গ, তাতে ক্রম আছে। আনন্দ বেশী, জ্ঞানও বেশী। তবে কর্ম একেবারে নেই, তা' নয়। পুণ্য-যুক্ত জ্ঞান, জ্ঞানও আছে পুণ্যও আছে। শুধু এমন পুণ্য নয় যে পুণ্যেতে জ্ঞানের সম্বন্ধ নেই।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই যে তিনটি জিনিষ, এই নিয়ে হচ্ছে আমাদের বিশ্ব। কিন্তু যাঁরা আগমবাদী তাঁরা বলেছেন এ-কথা যে আমরা বললাম বটে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, সপ্তলোক করলাম, এর মধ্যে পাতাল আছে, নাক আছে, সব নিয়ে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। মূলে কিন্তু সবটাই ভূঃ। এটাকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ভূঃ, বলে ধরে নিয়েছি বটে, সেটা হ'ল স্থূল ভাবের কথা। মূলে সবটা নিয়েই পৃথিবী।

আর একটা কথা মনে রাখতে হ'বে, আমরা ভূলোক বলছি আর ভূমণ্ডল বলছি, এ দুটো এক জিনিষ নয়। এখানে অনেকের অনেক confusion হয় এবং সেটা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সেটা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। ভূঃ বললাম যেটা এই রকমের অসংখ্য ভূঃ আছে—সাধারণভাবেই বলছি, স্তরের কথা বলছি না, তাতেও অসংখ্য আছে। আমরা যাকে পৃথিবী বলছি, এই

রকম কোটি কোটি পৃথিবী আছে। তাকে ঘিরে একটা আবর্ত আছে। সেই যে আবর্ত্তটা সেটা যদি ভূঃ-র আবর্ত্ত হয়, তাহলে ঐ যে মধ্যবিন্দু থেকে কোন একটা বিন্দু ঐ আবর্ত্তের মধ্যে—ঐ ঘেরের মধ্যে নিয়ে তার সঙ্গে যোগ করে যদি রেখাটি করা যায় তাহলে সেই রেখাটি হবে একটি অক্ষরেখা। ঐ অক্ষরেখাকে অবলম্বন করে ঐ ভূঃ থেকে অর্থাৎ ঐ পৃথিবীর স্থান থেকে মধ্যবিন্দু পর্যন্ত যাওয়া যায় কারণ ঐ বিন্দুটাকে আমি যদৃচ্ছা কল্পনা করে নিয়েছি কিনা। সমস্ত মণ্ডলের মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ রকম একটা বিন্দু নিতে পারেন। ঐ মণ্ডলটাই ভূমণ্ডল। কোটি কোটি অনন্ত কোটি বিন্দু হতে পারে। প্রত্যেকটা বিন্দুই হচ্ছে ভূঃ। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটাও ভূঃ তেমনি এই রকমের কোটি রকমের ভূঃ আছে। সেই মণ্ডলের অন্তর্গত এই ধরে নিতে হবে। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে মধ্যবিন্দু, যে মধ্যবিন্দুকে লক্ষ্য করে আমি চলব সরলরেখা ধরে—অক্ষরেখা ধরে। কিন্তু অন্য বিন্দুতে, ভূঃ বিন্দুতে তার মধ্যবিন্দুতে যাবে তার যোগসূত্র যেটা অর্থাৎ তার বিন্দুর সঙ্গে মধ্যবিন্দু যোগ করে দিলে যে রেখাটি হবে সেই রেখাকে আশ্রয় করে মধ্যবিন্দুতে তাকে যেতে হবে। এইরকম সব জায়গাতে।

সুতরাং যখন ভূঃ ভেদ করব তখন বুঝতে হবে আমার এই ভূঃটাকেই ভেদ করলাম না—সমস্ত ভূঃটাই ভেদ করলাম কেননা plane একটাই কিনা। ভূঃ কোটি কোটি হতে পারে কিন্তু সমস্ত ভূঃগুলো একটা planeএতেই আছে—একটা plane ছাড়া কিছু না। ষট্‌চক্রের ভিতরেতে—প্রত্যেকটি চক্রের যেটি মধ্যবিন্দু সেটা আছে সুষুম্নার ভিতরেতে—সুষুম্নার যে ধারাটা মূলাধার চক্র তার মধ্যে বিন্দুটা রয়েছে, আবার স্বাধিষ্ঠানে যে মধ্যবিন্দু সেটাও সুষুম্নার ভিতরেতে আছে। আবার সেই সুষুম্নাতেই আছে মণিপুর চক্রের মধ্যবিন্দু, অনাহত চক্রের মধ্যবিন্দু, বিশুদ্ধ চক্রের মধ্যবিন্দু, আজ্ঞাচক্রের মধ্যবিন্দু। তাহলে সুষুম্না রেখা এমন একটি সরলরেখা যে রেখাতে যে কোন pointই হোক না কেন, মধ্যবিন্দু কল্পনা করে যে চক্রটি অঙ্কিত করা যায় সে হল এক একটা দেহের চক্র। কাজেই চক্র যেখানেই থাক না কেন—ষটচক্রের জায়গায় যদি সহস্রচক্রও হয় তাহলেও তার মধ্যবিন্দুটা সুষুম্নার মধ্যে থাকতে বাধ্য—তা না হলে মধ্যবিন্দু হতে পারে না। তেমনিতর আমাদের এই ভূঃ ছাড়া হাজার হাজার ভূঃ থাকতে পারে, পৃথিবী হাজার হাজার থাকতে পারে কিন্তু পৃথিমণ্ডল যেটা, ভূমণ্ডল যেটা, সেটা কিন্তু একটাই সেখানে কোন ভেদ নেই। যখন তত্ত্বভেদ

অনুসারেতে আমাদের দেখতে হয় তখন মণ্ডলভেদ কিংবা কোন particular স্তরভেদ লক্ষ্য করি না। আমরা লক্ষ্য করি সেই তত্ত্বটা—এই হল সবচেয়ে বড় কথা।

কে কোন স্তরে আছে, এখন কেউ হয়তো ঊর্ধ্বলোকে আছে, আবার তার চেয়েও হয়তো আরও ঊর্ধ্বলোকে কেউ আছে—হতে পারে সেটা কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা দৃষ্টি অনুসারে। মূলেতে কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টি একটাই। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিকেও যদি আমি ভেদ করতে পারি তাহলে একটা নিম্নতত্ত্ব থেকে ঊর্ধ্বতত্ত্বে গতি হবে—সেটাই হল প্রকৃত উৎকর্ষ। আগমবাদীগণ বলেন, আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের কথা যেটা বল্লাম সেটা কিছুই নয়, সমস্তটাই পৃথিবী। পৃথিবতত্ত্বটাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বলে কল্পিত। সুতরাং যখন আমাকে সমস্ত বিশ্ব ভেদ করে যাত্রা করতে হবে তখন এই পৃথিবতত্ত্বই ভেদ করতে হবে। একটা পৃথিবী বা দুটা পৃথিবী বা দশহাজার রকমের লোকলোকান্তর ভেদ করলেই যে আমি সার্থক হব তা নয়, সমস্তটাই ভেদ করতে হবে। এই তত্ত্বের মধ্যে কি আছে ?—না ভুবন আছে। আর তত্ত্বগুলো আছে কিসের মধ্যে ?—না কলার মধ্যে। কলাকে আশ্রয় করে তত্ত্বগুলো রয়েছে। আর তত্ত্বকে আশ্রয় করে ভুবনগুলো রয়েছে আর ভুবনের মধ্যে সব জীব রয়েছে। একটা জীব হয়ত একটা তত্ত্বে আছে, অন্য জীব হয়ত অন্য তত্ত্বে আছে, আবার হয়ত এই তত্ত্বতেই একটা জীব এক ভুবনে আছে, আর অন্যজন অন্য ভুবনে আছে। একই তত্ত্বের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভিন্ন ভুবন। যেমন একই প্রদেশের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন নগর থাকতে পারে বা অন্য প্রদেশেও থাকতে পারে এগুলি বিচার করবার জিনিষ। এই হিসাবেতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই হল পৃথিবী। আবার এই পৃথিবী এক রকমের নয় এর মধ্যে রকমফের আছে। পৃথিবতত্ত্বের পর জল-তত্ত্ব আছে। সেই জলতত্ত্বের মধ্যেও ভুবন আছে—অনেক ভুবন আছে। অন্যান্য তত্ত্বও আছে, তবে জলতত্ত্বই প্রধান। তেজতত্ত্ব আছে। মায়ার মধ্যে একত্রিশটা তত্ত্ব আছে। ৩১টা তত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্বকে আশ্রয় করে কতকগুলি ভুবন আছে। আবার একেকটি ভুবনকে আশ্রয় করে অসংখ্য উপভুবন রয়েছে। তার মধ্যে শাখা, প্রশাখা, উপশাখা আছে যেমন নাড়ীর ভিতরে শাখা প্রশাখা হয়। তেমনই বিশ্বের ভিতরে লোক লোকান্তরের সংস্থান যেটা সেটা সেই রকম। এই হল cosmography। এই সমস্তটা নিয়ে হল ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মাণ্ডের পর রয়ে গেল জলতত্ত্ব থেকে নিয়ে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্যন্ত। এই যে তত্ত্বগুলি রইল তার প্রত্যেকটার মধ্যে ভুবন আছে। সবটা নিয়ে totality যার নাম প্রকৃত্যণ্ড—আরেকটি অণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড যেমন হাজার

হাজার কোটি কোটি আছে তেমনিতর প্রকৃত্যণ্ডও হাজার হাজার কোটি কোটি আছে। কিন্তু একটি প্রকৃত্যণ্ডের মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে, এইটে মনে রাখতে হবে। কাজেই কোন্ ব্রহ্মাণ্ড কোন্ প্রকৃত্যণ্ডের মধ্যে এটা না জানলে ঠিক আমার গতিটা সরল হবে না। এটা জানা দরকার। এই যে প্রকৃত্যণ্ড বললাম এর backgroundএ আছে মায়াণ্ড। সুতরাং একটি মায়াণ্ডের মধ্যে অসংখ্য প্রকৃত্যণ্ড এবং একটি প্রকৃত্যণ্ডের মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। একটা মায়াণ্ডের মধ্যে কত ব্রহ্মাণ্ড যে আছে তার কোন কল্পনাই করা যায় না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লীলা উপাখ্যান পড়লে এসব বুঝতে পারা যায়। কোন জীবের মৃত্যু হলে এই ব্রহ্মাণ্ডেই জন্ম হবে এমন কোন কথা নেই। অন্য ব্রহ্মাণ্ডেও জন্ম হতে পারে। সবই তো কর্মভূমি। কর্মফল অনুসারে সব হয়। যিনি জগৎ করেছেন তিনি যেমন অনন্ত তেমনি তাঁর সৃষ্টির কণাও অনন্ত।

মায়াণ্ডটা হল অন্ধকার—অজ্ঞানের অন্ধকার। এই অন্ধকার সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অন্ধকারটা মায়াণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড, ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহকে অধিকার করে রয়েছে। এই অন্ধকারের পরেও একটা স্তর আছে সেটা হচ্ছে world of light—এটাকে বলে শাক্তাণ্ড—চিৎশক্তি। এই চৈতন্য-শক্তি দিয়ে জগৎ তৈয়ারী হয়েছে। তারও ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। সেই সব details-এর মধ্যে এখন যাব না। মোটামুটি স্তরগুলি হ'ল শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব। এইসব স্তরে জন্মমৃত্যু হয় না। এই স্তরগুলিতে অবিদ্যা নেই, মায়ার খেলা নেই। তাহলেও সেখানে সাকার আছে, দেশ আছে, বৈচিত্র্য আছে, ফুল, ফল, লতাপাতা সবই আছে। সেখানে higher or lower স্তর আছে। আমরা যে উপাসনা করি—মন্ত্র বলি, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা তাঁদের স্থান সেইসব জায়গাতে—যেটা মায়াতীত। তাঁরা আমাদের মায়াতীত লোকে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা সকলে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন—তাঁদের মত ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন অনন্তকোটি আছেন। পরমেশ্বর অনেক বড় জিনিষ, অনেক দূরের জিনিষ। যাই হোক, সেটা হচ্ছে শুদ্ধ জগৎ, নির্মল জগৎ। এই হল শাক্তাণ্ড কিন্তু তবু সেটা অণ্ড।

অণ্ড হলে কি বুঝব? সেখানে কি জীব বা চিন্ময়শক্তিসম্পন্ন কেউ যেতে পারে না, থাকতে পারে না? হ্যাঁ পারে। তারপরেও অবস্থা আছে—অণ্ডভেদ করে। কিন্তু সেখানে অণ্ড না থাকলে আবরণ থাকে না। অণ্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা অণ্ড থাকলেই তার বাইরে একটা আবরণ থাকে—যেমন surrounding wall or compounding wall বাড়ীতে থাকে। আবার

আরেকটি অণ্ডেতে গেলে সেখানে আরেকটা ঘের আছে। আর যেখানে অণ্ড থাকে না অথচ জীব আছে সেখানে সব inter-penetrating। অর্থাৎ জীব রয়েছে—যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি জীব রয়েছে এবং অন্য ব্রহ্মাণ্ডের জীব আছে—আলাদা আলাদা জীব—এবং আলাদা আলাদা পুটের ভিতর রয়েছে —আলাদা আলাদা enclosure-এর ভিতর রয়েছে। অতি সূক্ষ্ম enclosure কিন্তু তবু একটা enclosure আছে। একটি bounding enclosure প্রকট আছে, যা নাকি demarcating করে। Demarcating enclosure কিন্তু যখন নাকি চারিধারের bounding ভেদ হয়ে যায় তখনও অনন্ত জীব রয়েছে—অতি উচ্চস্তরের জীব রয়েছে—তারা অণ্ডে থাকে না, তারা নিত্যমুক্ত শিবময় ভাবাপন্ন, সেখানে কে কোথায় আছে, বোঝবার উপায় নেই। আলাদা আলাদা কিনা। এখানে একটা আরেকটাকে exclude করে কিন্তু সেখানে একটা আরেকটাকে exclude করে না। সবটাই সবটাকে include করে—এইজন্য 'সর্বং সর্বাত্মকং' সেখানেতে যে কোন লোককে খুঁজলে যে কোন জায়গাতে পেতে পারেন অর্থাৎ একটা জায়গা ছেড়ে তার boundary-র বাইরে তা নয়, একের ভিতর অনন্ত রয়েছে। শিব মানে শিবের মধ্যে অনন্ত দেবতা রয়েছে। রাম বলেন তো রামের মধ্যে অনন্ত দেবতা রয়েছে। তারা অণ্ডবাসী নয়, এমন উচ্চাবস্থা আছে—কিন্তু কলার মধ্যে আছে। তারপর যখন যাবে তখন কলা নেই। মনও নেই, কোন বৈচিত্র্য নেই, এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা পড়ে রয়েছে,—সেই হচ্ছে পরমেশ্বরের স্থান। তার অনেক details রয়েছে, তার বলবার প্রয়োজন নেই। এইসব নিয়ে লোকসংস্থান। এই হল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ সুতরাং ভূঃ ভুবঃ স্ব বললে বুঝতে হবে এই তিনের অন্তর্গত সমগ্র সৃষ্টি। সমগ্র সৃস্টি কিন্তু সৃষ্টির অতীত যেটা সেটা নয়। সৃষ্টির অতীত তো ওঁকারের মধ্যে রয়েছে। সেই সবিতা যিনি প্রসব করেছেন তিনিই সৃষ্টিধর, সৃষ্টিকর্তা। তাঁর থেকেই স্ফুরণ হয়েছে—সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই মূল, তাঁর থেকে জীব প্রসূত।

ভগবৎ প্রেম

১লা বৈশাখ ১৩৮০, বিকেল ৫টা, ইংরেজি ১৯৭৩ ১৫ই এপ্রিল।

প্রশ্ন ঃ এই যে বলছিলেন ভগবৎ প্রেম আসবে, সেটা কি রকম? ভাগবতে নেই কেন সেটা?

উত্তর ঃ ভাগবতে কালের মধ্যে সে জিনিসটা—। যোগমায়ার মধ্যে সেটা এসেছে। ক্ষণের মধ্যে সেটা হয় কিনা। কালের মধ্যে যাঁরা আছেন—কাল থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা সকলেই করেন। God is Law and God is Love—এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় হয়নি। God is Law কাল রাজ্যের মধ্যে। God সবের নিয়ন্তা। God is Administrator—সেটা হচ্ছে একটা দিক। যেখানে God is pure Love—সেখানে Law-এর কোন স্থান নেই। সেটা হ'ল কোন্ জায়গা—সেটা Time and Spaceএর মধ্যে হয় না। সে-জিনিসটা অতি অদ্ভুত জিনিস, সাধারণ মানুষ তার এককণাও জানে না—সেটা এত দুঃখের বিষয়। কেননা সেটা ক্ষণের মধ্যে। কালের যেটা minutest particle সেটা হচ্ছে ক্ষণ। সে জিনিসটার কিছু আভাস দিয়ে গেছেন যোগ-দর্শনে 'একস্মিন্ ক্ষণে সর্বং জগৎ পরিণামমনুভবতি'।

একটা ক্ষণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের পরিণাম হয়। সেই ক্ষণটা পাচ্ছো কোথায়? আমাদের যা কিছু কাজ আমাদের গুরুদেব নির্দিষ্ট করে রেখে গেছেন এখনও ফোটেনি সেটা! মহানিশার ভেতরেতে। যেটাকে বলা হয় অখণ্ড মহাযোগ।

এই ক্ষণের রাজ্য কোথায়? ক্ষণটা হচ্ছে কালটা যেখানে শেষ হয়ে গেল—কালটা যেখানে শেষ হয়ে গেল সেইখানে যে Eternity সেটা স্ফুরণ হয়ে উঠলো, সেইটা হচ্ছে ক্ষণ, এখন সেটা কোথায়? সেই ক্ষণটা কোথায়? ক্ষণটা হচ্ছে হৃদয়ে। এই গুহ্য বিষয়ে এত কথা আছে যে, দু হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও শেষ হবে না। সাধারণতঃ পুরাণে, ভাগবতে যে জিনিস আছে সে অন্যরকম জিনিস—এ জিনিস নয়, ভাগবতে প্রেম নিয়ে সাধারণভাবে যা আছে তা আছে, কিন্তু যেটা Ideal সেটা হচ্ছে বড়—এবং সেটি হচ্ছে হৃদয়। হৃদয়টা হচ্ছে ক্ষণ এবং হৃদয় যেটা সেখানে সমস্ত Space শেষ হয়ে যায়! অথচ সেটা নির্গুণ নয়।

নির্গুণ সেটা, নিষ্কল সেটা নয়, নির্গুণের স্তরেতে সে যায় না। অথচ সগুণ শেষ হয়ে গেছে—সেই জায়গাটা হচ্ছে হৃদয়।

অথচ সে জায়গাটা তুমি পাবে কি করে? সেই জিনিসটা হচ্ছে দুইটি বিন্দু যেখানে এক হয়ে গেছে—সেই বিন্দু দুটি—একটি মূলাধারের নিচে—একটি রক্তসহস্র দল কমল আর একটি শ্বেতসহস্রদল কমল। ঊর্ধ্বে সহস্রদল কমল—সেখানে রয়েছে একটা বিন্দু—সেই বিন্দুটাকে আকর্ষণ করতে হবে। আর অধঃতে একটা সহস্রদল আছে, তাতে একটি বিন্দু আছে—সেই বিন্দুকে আকর্ষণ করতে হবে। এই দুটি বিন্দুর যোগ হবে। এই দুটি বিন্দু আসবে কামরাজ্যকে ভেদ করে। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। তখন যেখানে সেটা meet করবে (মিলিত হ'বে)—সেটা করবে হৃদয়েতে। এই দুটো তখন এক হয়ে যাবে—সেখানে অখণ্ড মহাপ্রকাশ হবে। সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ সাকার—নিরাকার নয়। সমস্ত জগতের মধ্যে সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ প্রকাশিত হবে। কিন্তু লোকে সেটা পাবে না। যেখানে হবে সেইখানে প্রকাশ হবে। কিন্তু প্রকাশটা হয়ে গেল সব জায়গায়। আবির্ভাবটা হয়ে গেল—সাকার মহাপ্রকাশের। সচ্চিদানন্দের সৎ, চিৎ, আনন্দ, সমসূত্রেতে যে জিনিসটা, সেই যে সেই মহাপ্রকাশ সেটা হচ্ছে Advent, সেই জিনিসটা হবে হৃদয়েতে—সেটা হবে লীলামঞ্চ। অনন্তশক্তির ব্যাপার যেখানে এবং পৃথিবীর যে নিকটস্থ শক্তি সেটাই হচ্ছে নব-মুণ্ডী। নবমুণ্ডীকে রাখাই হয়েছে সেইজন্য—যে অবস্থাতে জীবকে সহজে টেনে নেওয়া যেতে পারে। তারপরেতে উমাশক্তি, কুমারীশক্তি যেটা, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উপরেতে। মহাশক্তির কয়েকটি রূপ বা অবস্থা আছে—সবচেয়ে নীচের যে শক্তি সেটা হচ্ছে নবমুণ্ডী—এই দুটি বিন্দুর যে মিলন হবে—দুটো meet করবে পরস্পর পরস্পরকে—সেই সময়ে সেই মহাপ্রকাশের প্রকাশ হবে। মহানিশা ক্ষণেতে হবে, একটা ক্ষণেতে। সেইখানে যে জিনিসটা আসবার কথা আসা হয়ে গেল। একটা moment-এর মতো জিনিস। তখন যে আধারেতে আসবে—এসে গেলে সে আধার যা ছিল তাই থাকবে। যেমন মনে কর জল, বরফ, বাষ্প—একই তো জিনিস। এতো H_2O। জিনিসটা একটা, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে তিনটা—একটা Solid একটা Liquid আর একটা Vapour-gas অবস্থা। এখানেও ঠিক একই অবস্থা, একটাই জিনিস। সেই চিৎ, সেই সৎ, সেই আনন্দ। সচ্চিদানন্দ যেটা সেটা একটাই জিনিস, কিন্তু তার তিনটে অবস্থা। সদ্ অবস্থা যখন, তখন কোন স্ফুরণ নেই, চিৎ অবস্থাতে তার থেকে স্ফুরণ হবে, স্ফুরণ হয়ে তারপরে সেটা আনন্দে

পরিণত হ'ল—সেটা নিত্যলীলাতে পরিণত হবে, সেটিই হচ্ছে সৎ, চিৎ, আনন্দ। এবং সেই যে জিনিসটা তাতে অধিকার থাকবে সমস্ত বিশ্বের—সমস্ত জীবের। সে অধিকারের ভেতর অনেক রকম ব্যাপার আছে। তিনটি কাম্য জিনিস রয়েছে তো? তার মধ্যে প্রথম জিনিসটাই হচ্ছে অমরত্ব। যা জগতে আসেনি। জগতে সকলেই বলে মরব না, মরব না, কিন্তু মরে সকলেই। মহাভারতের মধ্যে আছে 'কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্'।

কালটা অখণ্ড। লীলা করে কালের ভেতরে তাকেও চলে যেতে হয়। যেখানে স্ফুরণ হচ্ছে সেটা কালের অধীন। তিনি নিত্য যেখানে আছেন, সেখানে স্ফুরণ কই? এমন একটা সময় আসবে যেখানে death will disappear। অর্থাৎ এমন সব জীব আসবে যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে যোগ থাকবে না।

এর বীজ-বপন কোথায় হয়েছিলো বলত? উপনিষদের মধ্যেতে বীজ-বপন রয়েছে। কি আছে উপনিষদের মধ্যে বলত? "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"...শৃন্বন্তু বিশ্বে আমরা ছোট-বেলাতেও পড়েছি কিন্তু তখন কি সেটা বুঝতে পেরেছি? এখন বুঝেছি। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' যে সিরিজ আছে এর মধ্যে অনেক কথা আছে। ভালো, ভালো কথা আছে, কিন্তু আসল জিনিস যেটা সেটা তিনিও জানেন না, কেউ জানে না।

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ", তিনি বলেছেন—জেগে উঠে কোন ঋষি আর কি—যারা অমৃতের পুত্র—সকল অমৃতের পুত্র তোমরা শোনো, তোমরা সকলে শোনো, একজন কি দুজনকে বলছেন না, সমস্ত অমরদিগকে বললেন, সেই যে পুরুষ, যিনি রয়েছেন, সেই একটি পুরুষই আছেন এবং আমি তাঁকে জেনেছি—তাঁকে দেখেছি—'আদিত্যবর্ণং' ঠিক এই সূর্যের মতো। অনন্ত কোটি কোটি সূর্য একত্র করলে যেমন হয় তেমন, বোঝাবার উপায় নেই কিছু, 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—এ পারটা হচ্ছে ঘোর অন্ধকার—'Chaos'। Milton-এর 'Paradise Lost'এ যেমন 'Chaos' সেই Chaos। আর সেখানটা হচ্ছে একেবারে আদিত্যবর্ণ। সে পুরুষ অন্ধকারকে ভেদ করে। মনুসংহিতায় যেমন আছে না?—'আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণম্'—সব জায়গাতেই তমোটা আছে—এই তমোটা না হলে মহাপ্রলয় বা সৃষ্টি হয় না। এর থেকে সৃষ্টি হয়, এর থেকে মহাপ্রলয় হয়। তমোর ওপারেতে আছে এই সূর্য—এইরকম অনন্ত কোটি কোটি সূর্য তার স্ফুলিঙ্গের মতো। তাঁকে একবার

জানতে পারলে, দেখতে পেলেই তার আর মৃত্যু হবে না। আর হতে পারে না। 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি'···'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'- তাঁকে সেই পুরুষকে ধরবার জন্য আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সকলরকম ওষুধ খেয়েও হবে না। কোনরকম জরা, মৃত্যু কিছু হবে না। এই যে অবস্থাটা হচ্ছে তা হলো 'অতি-মৃত্যু' অবস্থা। এই জিনিসটা জগতে প্রকাশ হবে। সম্পূর্ণ সেটা প্রকাশ হবে। এখন সেটা গুপ্তভাবে আছে। আগে ঋষিরা বলে গেছেন, কিন্তু সে কাল পূর্ণ হয়নি বলে সেটাকে তখন কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ছিল, কলি যেই শেষ হয়ে যাবে তখন সেই 'অতি মৃত্যু' অবস্থাটা আসবে। তারপরেতে পূর্ণ জ্ঞান—তারপরেতে পূর্ণানন্দ-সচ্চিদানন্দ। সব অপূর্ণ রয়েছে, কোনটাই পূর্ণ হয়নি। যাই হোক, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'···সেটাকে পেতে হলে আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এইটা হ'ল প্রথম জিনিস। এই প্রথম জিনিস হ'ল General, যেটা সাধারণ জীবের জন্য অতি-মৃত্যু অবস্থাটা প্রাপ্ত করা। অতি-মৃত্যু অবস্থা অনেকেই পেরিয়ে গেছে। অতি-মৃত্যুর অবস্থার পর যে অবস্থাটা আসবে সেটাই হবে মহাপ্রকাশ।

সত্তাটা পেয়ে গেল—সত্তাটা পেয়ে তারপর প্রকাশটা আসবে। এই যে প্রকাশটা আসবে, সেই প্রকাশের ভেতরেতে কোন স্পন্দন নেই। সেটা যখন আসবে যতটা জানা গেছে তাই বলছি, (একটুখানি, সামান্য), সেটা আসবে একটা ক্ষণের ভেতর—কোন আলোর মধ্যে নয়, কোন নক্ষত্রের মতো নয়, না কিছু না, একটা ক্ষণের মধ্যে সে জিনিসটা প্রকাশ পাবে। একটা ক্ষণের মধ্যে হবে। সেটা সম্ভবতঃ মহানিশা ক্ষণেতেই হবে। যে কোন সময়েই হোক, হয়ে গিয়েই যে আধারেতে হবে (কোথায় হবে কেউ তা বলতে পারে না) সেটা প্রকাশে পরিণত হয়ে যাবে। একটি ক্ষণ। তারপরে সে যেমন ছিল তেমনিই থাকবে। ঐ যে জিনিসটা এসে গেল, সে প্রকাশেতে প্রকাশময় হয়ে গেল, সে প্রকাশাত্মা হয়ে গেল। তারপরে সে যেমন আছে, তেমনি আছে। হাত আছে, পা আছে, মুখ আছে,—যা আছে তাই আছে। যা নাকি কালের জগতের মধ্যে আছে, সবই থাকবে। তা'বলে সেই যে জিনিসগুলো থাকবে আবার আগের যা ছিল তা কিন্তু এক নয়।

আগে যেগুলো ছিল—সেগুলো মহাপ্রকাশের থেকে হয়নি। এখন সেগুলো মহাপ্রকাশের সঙ্গে Converted হয়ে গিয়ে আবার Reconverted হয়েছে সেই আধারটা দিয়ে কাজ হবে সেখানে। সেইটি হচ্ছে আধার—সেই আধারটি হচ্ছে একদিকে ব্যষ্টি আর একদিকে সমষ্টি।

এবং ব্যষ্টি, সমষ্টি ছাড়া আর একটি হ্চেছ দিব্য দিক্—দিব্য একেবারে অর্থাৎ যা ব্যষ্টি, সমষ্টির মতন নয়। যতো রকমের Human aspects আছে সে সমস্তগুলো সে represent করে। এবং প্রত্যেক মানুষই সে জিনিসটা পাবে এবং সে জিনিসটা এসেছে মানুষকে দেবার জন্যেই—কেউ আজ পাবে, কেউ দশ বছর পরে পাবে, কেউ দশহাজার বছর পরে পাবে, কিন্তু পাবে। সকলেই পাবে সেটা, কিন্তু সমান পাবে না। কিন্তু যে পরে পাবে, এখন পাবে, তারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ কালের রাজ্যে চলতে থাকবে। কালের রাজ্যের সঙ্গে parallel চলবে। ওই যে জিনিসটা এসে গেল, ওই জিনিসটা আসাতে তখন হ'ল কি, কালের রাজ্যেতে কেউ যদি ওই আভাস পেয়ে যায়, প্রাণেতে ব্যাকুলতা যদি এসে যায়, সে যেখানে থাকুক, লক্ষ কোটি মাইল দূরে থাকলেও সে মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে স্ফুরণ হবে। তাকে আর যেতে হবে না, কাগজ পত্রের দরকার হবে না।

খবর দিতে হবে না, কিছু করতে হবে না। এটার নাম হচ্ছে জীব-কল্যাণ, জগৎ কল্যাণ। প্রাণ ব্যাকুল হলেই প্রত্যেকে পাবেন। আর কোন conditionই নেই সেখানে, শুধু ব্যাকুলতাই condition। সেই বস্তুটাই তো হচ্ছে দুর্লভ জিনিস। যখন এসে গেল তখন তা যে common তার জন্যে, যে uncommon তার জন্যও। যে অবস্থায় এসেছে, সেগুলো সে পাবে। ক্রমশঃ জীব পেতে থাকবে—ব্যষ্টি রূপে পাবে, সমষ্টি রূপেও পাবে। ঊর্ধ্বে যারা আছে দিব্যজীব, তারাও পাবে। যতগুলি aspect আছে মানুষের সেগুলি সব চরিতার্থ হয়ে যাবে। যেখানে প্রকাশিত হয়ে গেল, সেখানে বাইরে থেকে কালের কোন ক্রিয়া থাকবে না। কি রকম বলত? একজন সাধক ছিলেন। সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান বলে একখানা বই ছিল তাঁর। স্যার আশুতোষ যেবার দুর্গাপুজো করেন কাশীতে সেইবারের কথা বলছি। সাধুর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। সাধুটির বাঙালী শরীর ছিল, তিনি অগস্ত্য কুণ্ডে থাকতেন। তিনি 'মাউন্ট আবুতে' গিয়েছিলেন, সেখানে এক মহাপুরুষের সন্ধান পান। তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব ছিল না, কেননা তিনি সর্বদাই প্রায় সমাধিস্থ থাকতেন, একদিন যেই জেগেছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর গলায় তিনি মালা পরিয়ে দেন—আবার সমাধিস্থ। পরে ২।৩ মাস পরও সে মালা শুকায়নি। এই যে সমাধিস্থ হয়ে থাকার ফলে কালের ক্রিয়া সেখানে হলো না, তখন তিনি বললেন, কাল চলে গেলেই কালের যে ক্রিয়া বা পরিবর্তন সেটা থাকে না। এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। কালের effectটা কালের বাইরে চলে গেলে আর হয় না—সেটা বুঝতে পারলেন

ভদ্রলোক। তাদের মধ্যে যাঁরা পেয়ে গেলো, তারা পেয়ে গেলো। যারা পেলো না, তারা বাইরে রয়ে গেল। এই কাল স্পর্শ করতে পারলে তারপরে সে উচ্চ অধিকার আসবে, তখন সকলে সে অবস্থাটা লাভ করলে অধিকারীরা তাদের মধ্যে সে জিনিসটা ভাগ করে নেবে।

অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু কার কখন হবে কেউ বলতে পারে না। সেইটাই হচ্ছে মহাপ্রকাশের ধারণা। এই মহাপ্রকাশের ধারণা করতে পারলে তাকে কাল স্পর্শ করতে পারবে না। অথচ তার ভেতর থেকে ক্রিয়াগুলো হবে। এখন তিনি তাঁর সত্তাকে divinise করেছেন—divinised হয়ে গেল সত্তাটা। সে-সত্তাটা কালের সত্তা থাকলো না—যে-সত্তাটা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অথচ বাইরেতে সেই রকমই সব থাকলো—বাইরে থাকলেও কালের জগতের মতনই সে অবস্থাটা—কালের জগতে যে ক্রিয়াগুলো হয়, সে ক্রিয়াগুলো তার শরীরে হচেছ না। তখন মহাপ্রকাশকে পাওয়া যাবে। এই মহাপ্রকাশকে পাবার অধিকার হয়ে গেলে তখন দুটো অবস্থা আসে—সাকারের থেকে লীলায় অধিকার হবে– লীলাটা হচ্ছে আনন্দ যেটা—সে আনন্দরাজ্যে যাবার জন্য নিত্যলীলা যেটা। আজকে এইখানেই থাক। একদিনে তো সব হবে না। পরে আবার বলবো। তোমাকে একটা idea দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সেদিন দুটি বিন্দুর কথা বলছিলেন, একটা সহস্রদল পদ্মের উপরে যে বিন্দু, আর একটা হচ্ছে নীচের পদ্ম—এই দুই পদ্মের যে বিন্দু কোথায় মিলন হবে এবং কেমনভাবে মিলন হবে ?

উত্তর ঃ সহস্রদল কমলের উপর যে বিন্দুটা আছে, সহস্রদল কমলের সহস্রদল যেটা সেটার উপরে যে বিন্দুটা আছে আর একটা শাক্ত সহস্রার যেটা নাকি মূলাধারের নীচে। নীচে উপরে দুটো সহস্রার। তন্ত্র গ্রন্থে in details সহস্রারের কথা আছে—সাধারণতঃ যারা নীচের সহস্রারের খবর রাখে না তারা ষট্‌চক্রভেদ আর সহস্রারে যাবার কথা তারা বলে—কিন্তু আছে দুটি। এই দুটির Centre-এ বিন্দু আছে—কমলের centre যেটা। এই দুটি বিন্দুই কালের বাইরে। এ বিন্দুটাও কালের বাইরে, ও বিন্দুটাও কালের বাইরে অর্থাৎ অধঃবিন্দু এবং উর্ধ্ব বিন্দু। যে current চলছে সেটা কালের যত রকমের Current চলছে বলো আর অন্য কিছুই বলো—ভেতর দিয়ে চলছে।—আর ভেতরে যে current চলছে সেটা কালের ভেতর দিয়ে। যতরকমের current চলছে নার্ভাস current-ই বলো আর অন্য কিছুই বলো —সমস্ত কালরাজ্যের ভিতর দিয়ে চলছে—এই বিন্দু দুটি—উপরের বিন্দু

নীচে নেমে আসবে—আর নীচের বিন্দু উপর দিকে আসবে, দুটো এসে হৃদয়ে meet করবে। এই যে হৃদয়ে যেখানে বিন্দু দুটো meet করবে, সেটাই হচ্ছে লীলামঞ্চ। সেটা হচ্ছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাতে accomodate করা যায়। এটা Time and Spaceএর মধ্যে নয়। সেখানে গিয়ে কার কি position হবে—কমলের যে দল আছে সে দলানুসারে কে কোথায় বসবে নিজলীলার ভেতরেতে—এক রকমের শক্তি তাতো নয়, কারো অধিকার বেশী, কারো অধিকার কম। সকলেই নিজের নিজের স্থিতি অনুসারে সেখানে সে স্থান পাবে। প্রথমতঃ এ বিন্দু দুটি meet করবে যখন, তখন এই বিন্দু দুটোর মাঝখানে intermediate অনেক সব ব্যাপার আছে।

কালরাজ্যের মধ্যে বিন্দু যে-সব, সে-সব নানারকমের বিন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইগুলো শরীরের ভেতরেতে যে। সেগুলোর মধ্যে সব কালরাজ্যের ব্যাপার আছে। যখন ঊর্ধ্ব বিন্দু, অধঃ বিন্দু meet করবে তখন ওই দুটো বিন্দুই বিসর্গের বিন্দু। বিসর্গের যে দুটো বিন্দু থাকে, সেই দুটি বিন্দু। একটি অধঃ বিন্দু। আর একটি ঊর্ধ্ব বিন্দু। এই বিন্দু দুটি meet করলে হৃদয় খুলে যাবে। তার পূর্ব পর্যন্ত লক্ষ বছর কিংবা লক্ষ দিনেও খুলবে না।

সুতরাং যখন অবস্থাটা আসবে, তার পূর্বেই এগুলি হওয়া চাই, যখন ঠিক meet করবে তখন space থাকবে না। বাইরের জগতের কিছু থাকবে না। সেটা অন্তর জগতে থাকবে—সেই hyper space। সেটা এই কাল-রাজ্যের নয়। কাল শেষ হয়ে গেল, আর কালাতীতের যে নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ, নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ সেটাও নয়, এই দুইয়ের মাঝখানে। সেটাই হচ্ছে লীলামঞ্চ, লীলাস্থান। সুতরাং সেটা নির্গুণের মধ্যে যেতে পারে না, সেটা হচ্ছে সগুণ সাকারের ভেতরেতে। অথচ কালরাজ্যের মধ্যের সাকার নয়—কালরাজ্য শেষ হয়ে গেলো। থাকলো কি জিনিষটা? পয়েন্ট—তার নাম হচ্ছে বিন্দু। বিন্দুটা সাধারণতঃ ক্ষণ, একট্য ঊর্ধ্বক্ষণ, অধঃক্ষণ—এই দুটি ক্ষণ meet করলে বিশ্বটা খুলে গেল, সেই infinite space—hyper space-এর space নেই অথচ space আছে—তা না হলে লীলা হবে কি করে? সেখানে অনেক বৈচিত্র্য আছে—অনেক বৈচিত্র্য! সে সব অনুভবের কথা বলবো তোমাকে—যখন মানুষ এগুলো প্রত্যক্ষ অনুভব করবে তখন বুঝতেই পারবে, দেখতেই পাবে সব। এখন সেটা সাধারণ লোকের বুঝবার জিনিস নয়, মানবারও জিনিস নয়। সেই জিনিসটা কোন শাস্ত্রের, বইয়ের জিনিস নয়, যা কোন কালে হয়নি তা কি করে বুঝবে বল?

চাই মানো, চাই না মানো—সেটা আলাদা কথা। আমরা জানি, কারণ গুরু-পরম্পরায় পাচ্ছি সে জিনিসটা কাজেই সেটায় অনেক রহস্য রয়েছে। তাই সে ছাড়া অন্য কেউ ধরতে পারে না—আর একটা আছে নিত্য অবস্থা যেটা—সে অবস্থাতে লীলা থাকবে না অথচ কালের যে ধ্বংস কলা সেটাও থাকবে না। অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা নিত্য অবস্থা লাভ করেছেন। অথচ তাঁরা কালের রাজ্যের ভেতরে আসেননি। কখনো মরবেন না এমন লোক রয়েছেন—সিদ্ধপুরুষ যাঁরা—নিত্যসিদ্ধ। তাঁরা beyond death অথচ higher realisation-এর এক কণাও পাননি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে যে আকাঙ্খা রয়েছে—সে অধিকার যখন হবে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁরাও পাবেন। এখন দুটো দিক দেখতে হবে—নীচের দিকটা হলো কেবল স্থিতি। তার ওপরে হচ্ছে সচ্চিদানন্দ প্রকাশ। সাকারের মধ্যে আনন্দলীলা, সবকিছুর প্রকাশ।

নিরাকার যেটা সেটা নিরাকারেই আছে, সেখানে কোন লীলা নেই, আর যেখানে কালরাজ্য রয়েছে, সেখানেতেও কালের খেলা আছে। অথচ কাল-রাজ্যেতে যে অংশটা যোগেতে আছে—যে অখণ্ড মহাযোগ সব পরিবর্তন হয়ে গেছে সেটাতে। ভেতরে পরিবর্তন হয়েছে। কেননা সেই সঙ্গে যোগ রয়েছে তো সেটার। নিত্য ধাম যেটা—সেই ধামের সঙ্গে যোগ রয়েছে তো? বাইরের জগতের সঙ্গে তার তো যোগ নেই। সেই জিনিসটা রয়েছে—যে লীলাতে অধিকারী তার মধ্যে। তার মধ্যে কেউ lower অধিকারী কেউ higher অধিকারী—তার পরেতে যে একবার পেলো তাকে আর কোন খবর দিতে হবে না। যে কোন ব্রহ্মাণ্ডে সে থাকনা, যে কোন জায়গায় থাকনা কেন, এক second-ও লাগবে না সেখানে খবর দিতে। সে দেখতে পারবে, জানতে পারবে। সব প্রকাশ হয়ে যাবে। বলবার কোন দরকার নেই—কাজেই আমাদের জাগতিক দিক থেকে বর্তমানে বিজ্ঞানের দিক থেকে যে সব ফন্দির দরকার তার কোন কিছুই দরকার নেই। বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই, বিজ্ঞান অতদূর যাবে কোথায়? এই সব ব্যাপার জানার অনেক কিছু আছে।

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

(১)

আপাততঃ এই ক্রম ধরিলাম—পরমাত্মা-আত্মা-মন-ইন্দ্রিয়-বিষয়।

পরমাত্মার অংশ=আত্মা অথবা অণু=আত্মা। অনাদি কাল হ'তেই পরমাত্মা আত্মাকে বিকর্ষণ করিতেছেন। তাই আত্মা=অণু। বিকর্ষণ না করিলে পরমাত্মা হ'তে অণুভাব, পৃথকভাব হ'ত না। যখনই হয় তখনই বিকর্ষণ বুঝতে হ'বে। এই বিকর্ষণটা ভাল, পরে আকর্ষণ আসবে। বিকর্ষণ না হ'লে আকর্ষণ আসবে না। শুধু স্বরূপস্থিতি থাকবে কিন্তু বোধহীন। তাই তাঁর নিগ্রহও অনুগ্রহ। বিকর্ষণ=ঠেলা। আকর্ষণ=টানা।

আদিতে অণু=অণুভাবাপন্ন—এই ঠেলাতে। অণু হ'লেই মন আসে অর্থাৎ মনকে ঠেলা দেয়। মন ছিল না, মন হ'ল। যখন হ'ল তখনই বহির্মুখ।

বহির্মুখ মন আছে—তো তা'র ঠেলাতে ইন্দ্রিয় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে দেহ হ'ল।

ইন্দ্রিয়ও বহির্মুখ। রূপাদির দিকে ইন্দ্রিয় বিরুষ্ট হ'ল। বিষয়জ্ঞান, বিষয়স্বাদ এল।

বাইরে সত্তামাত্র ছিল, হ'ল রূপরসাদি। স্থূল জগৎ। বাইরে যে সত্তা ছিল তা'ও পরমাত্মাই।

(২)

তাঁর দুটি Pole—এক Pole হ'তে বিকর্ষণ করছেন, অপর Pole হ'তে আকর্ষণ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে। বিষয়ের বা স্থূলের আভোগ পূর্ণ হইলে তৃপ্তি আসে—satiety—আর বিষয় ভাল লাগে না। তখন বুঝতে হ'বে তিনি আর ঠেলছেন না। বিষয়ও টানছে না। বৈরাগ্য, নির্বেদ ইত্যাদি।

পরে বিষয় টানছে না তা নয়—ঠেলা দেয়। তিনি টানেন। তখন ক্রমশঃ ভিতরমুখী টান বাড়ে। ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হয়, আত্মা অন্তর্মুখ হয়—ইত্যাদি।

ইহার মাত্রা আছে। মন্দ, মধ্য, তীব্র। তাঁর ঠেলারও মাত্রা ছিল।

টানারও মাত্রা আছে। এই টান একসঙ্গে সব স্তরে হ'তে পারে—প্রায় তা' হয় না। ক্রমশঃ হয়।

তবে একটি কথা। মন্দ হ'তে তীব্রে যেতে হ'লে মধ্য হ'য়ে যেতে হয়। অবশ্য মধ্য না হ'য়েও যেতে পারে—অর্থাৎ অনন্নুভূতভাবে।

(৩)

এবার অন্তর্মুখী গতির কথা বলি। ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ—তখনই কর্ম-যোগ। পূর্ণ অন্তর্মুখ হ'লে তখন আর কর্ম নাই। মন অন্তর্মুখ ইহাই জ্ঞানযোগ। পূর্ণ অন্তর্মুখ হ'লে আর জ্ঞান নাই। আত্মা অন্তর্মুখ ইহাই ভক্তিযোগ। পূর্ণ অন্তর্মুখ হ'লে আর ভক্তি নাই—প্রেম, যোগ।

থাকে কিন্তু সবই। সব সময়ে সব থাকে। তবে প্রতীতি হয় স্থিতি অনুরূপ। ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হ'লে ইন্দ্রিয় মনকে স্পর্শ করে—পূর্বে ইন্দ্রিয় বহির্মুখ দশাতে মন ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করেছিল। ইন্দ্রিয় মনকে স্পর্শ করলেই মন হ'তে শক্তির বিকাশ হয়। মনই তো মূল শক্তি—তা'র জাগরণ হয়। মন জাগ্রৎ হয় শক্তিরূপে। তখন মন বা শক্তি আত্মাকে স্পর্শ করে—ফল হয় জ্ঞানের বিকাশ। আত্মাই তো জ্ঞানস্বরূপ।

সর্বত্র মধ্যাবস্থাটা স্থিতি। ইন্দ্রিয় মনকে স্পর্শ করে মধ্যাবস্থা=শক্তি-স্থিতি। তীব্র হ'লে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। তখন মন আত্মাকে স্পর্শ করে। সেখানে মধ্যাবস্থাতে স্থিতি, জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি। স্থিতি অবস্থায় অন্তর্মুখ বা বহির্মুখ থাকে না। সাম্য।

জ্ঞানস্বরূপে শান্ত আত্মাতে স্থিতির পর আত্মা পরমাত্মাভিমুখ হয়। তাহাই ভক্তি। তখন আত্মা পরমাত্মাকে স্পর্শ করে। এখানেও মধ্যাবস্থা সীমা। আত্মা পরমাত্মাভিমুখ হয়েছে—ভক্তি। ক্রমশঃ অন্তর্গতি বৃদ্ধি পাইয়া মধ্য দশা হ'লে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়।

তীব্র হ'লে কি হয়? যোগাবস্থাতে আত্মা ও পরমাত্মা যুক্ত। তীব্র হ'লে যে দশা তাহাই রমণ। তখন যোগ হ'তে এক বা অদ্বয় হয়। তাহাই স্বয়ম্।

ক্ষণ, সংকল্প ও বিকল্প, আত্মসমর্পণ

স্থান ঃ—শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম

২৩।১।৭৩ বিকেল সাড়ে চারটা ঃ

ক্ষণটা পালন কর। গুরু যখন রয়েছেন তখন আর চিন্তা কি? তাঁর আদর্শ পালন কর আর Punctual হব্যার চেষ্টা কর। এটা হচ্ছে ক্ষণের কাজ। করবে সেই জিনিষটাই যা গুরু বলেছেন কিন্তু Punctually কর—অন্ততঃ চেষ্টা কর। ক্ষণের কথা যে বার বার বলি এটাই তার importance—নূতন জগৎ যেটা হবে সে ক্ষণের উপরে হবে। আমাদের গুরুদেবের যে অখণ্ড মহাযোগ ছিলো সেটা ক্ষণের ব্যাপার নিয়ে। ক্ষণটা চাই। ক্ষণটা মানে punctuality—punctual মানে to the point—period of time নয়, point of time—point-এর উপর জোর আছে। punctual শব্দের পুরানো মানেও তাই ছিল। হয়তো কোন একটা জিনিষের current এসে চলে যায়, সেটা তো আমার miss করা উচিত নয়। ক্ষণের কর্ম বড় জিনিষ, ক্ষণেতেই সবকিছু হয়। সন্ধিপূজাটা হয় ক্ষণে। সব সময় চিন্তা করতে হবে জগতের যেন কল্যাণ হয়।

প্রশ্ন ঃ মানুষ তো স্বাধীন নয়—সে যদি সংকল্প করে তবে তা সিদ্ধ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তাহলে কি তার সংকল্প করা উচিত?

উত্তর ঃ তার কথা সিদ্ধ হবে কি করে? সংকল্পটা কিসের জন্য করে? সংকল্পটা করে একটা উদ্দেশ্যের জন্য—সেই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয়ে গেলেই সংকল্প পূর্ণ হয়ে গেলো। সংকল্প মানেই হচ্ছে আমি এটা চাই করতে—তারপর তোমার নিজের চেষ্টা দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেটা কার্যে পরিণত করা। সেটা যদি তুমি না কর তাহলে তোমার সত্ত্বগুণের বিকাশ হবে না, রজোগুণ তমোগুণের মধ্যে থাকবে। তমোগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণে দাঁড়াতে হবে, তারপর গুণের অতীত হয়ে যাবে। সেটা বড়ো কথা। তোমাকে সত্য-সংকল্প হতে হবে, তা হতে গেলেই শক্তির বিকাশ হওয়া চাই।

সত্য সংকল্পর সুর দেখে থাকলে দেখতে পেতে সেই বাইবেলের কথা

let there be light there was light. এইরকমের যা ইচ্ছা করবে তাই পাওয়া যাবে। সংকল্প না থাকলে কোনো কাজই হবে না। একটা চিঠি লিখতে গেলেও সংকল্প করতে হয়। চাকুরী করতে গেলেও সংকল্প করতে হয়। সংকল্প সিদ্ধ হয়ে গেলে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়—এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধি—ব্যাপক সিদ্ধি তারপরে। একটা অতি সাধারণ কথা, এর মধ্যে কি আছে? এরকম সংকল্প করতে হয় যেটা তুমি সিদ্ধ করতে পার। যে সংকল্প তুমি সিদ্ধ করতে পারবে না সেটা তুমি করবে না।

সংকল্পও থাকে না, বিকল্পও থাকে না। যেটা সংকল্প করা যায় তার বিরুদ্ধ জিনিষটা, আসলে তাকে বিকল্প বলা হয়। যেখানে সংকল্প নাই সেখানে বিকল্প কোথায়? আমি অমুক জিনিষটা চাই তা ছাড়া যে জিনিষটা আসে সেটা বিকল্পের মধ্যে সংকল্প করা উচিত। সংকল্প না হলে কর্ম'ই আরম্ভ হয় না। সংকল্প করে জিনিষটা পূর্ণ না করে অন্য জিনিষ করতে গেলে সংকল্প পূর্ণ হয় না তাতে বাধা হয়।

যেমন ধর গঙ্গাস্নান করব বলে বেরিয়ে গেলে, রাস্তায় অন্য কেউ তোমাকে অন্যত্র ধরে নিয়ে গেল, তাতে তোমার সংকল্প পূর্ণ হল না—বাধা হয়ে গেলো। সংকল্পটা পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর সংকল্পটা থাকবেই না, কেন না সেটা পূর্ণ হয়ে গেল। সমস্ত সৃষ্টিটাই সংকল্প দ্বারা হয়েছে—'ধাতা যথাপূর্বম্ অকল্পয়ৎ', বিধাতা যিনি, তিনিই সংকল্প করেছেন।

প্রশ্ন : Surrender কি অভ্যাসসাপেক্ষ ?

উত্তর : অভ্যাসসাপেক্ষও বটে আবার না-ও বটে। Real Surrender হঠাৎ হয়ে যাবে সেটা অভ্যাস-সাপেক্ষ নয়। Accumulated হবে ক্ষমতা, তখন Surrender হয়ে যায়, তা না হলে ছোট ছোট জিনিষ অভ্যাস করতে হয়। যেমন এক পয়সা করে দান করতে করতে ১০০০·০০ টাকা দান করা যায়। বুদ্ধদেব সবটাই দিয়ে দিয়েছিলেন। Surrender খুব বড় জিনিষ—মুখে বল্লেই তো হয় না, তা মনের থেকে হওয়া চাই। বুদ্ধদেব যখন সব ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর ভিক্ষুক হয়ে যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন তখন সেটা আর তাঁর নিজের বাড়ী নয়। তিনি ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। Surrender খুব বড়ো জিনিষ। Surrender না করলে বড় জিনিষ পাবে কি করে? ছোট আমিটাকে ত্যাগ করলে বড়ো আমিটাকে পাওয়া যায়। জোর করে কেউ ত্যাগ করতে পারে না। ত্যাগ হয়ে যায়। Surrender করার মতো অবস্থা নয়, সময়ের অবস্থা, একটা Real Surrender হয়ে যায়। আর অভ্যাস করতে হয় ক্রম-

টাকে—যেমন জপ করলাম ১০ বার, ১০০ বার, হাজারবার আর লক্ষ বার, আবার এমন অবস্থা এসে যায় যখন একবার করলেই লক্ষবারের কাজ হয়। সবাই নিজের নিজের সংস্কার নিয়ে এসেছে। সেই সংস্কারকে ছাপিয়ে যেতে হয়। কেউ পূর্ব জন্মের ভালো সংস্কার নিয়ে এসেছে—হঠাৎ খুলে গিয়ে current এর সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। সকলের সমান হয় না। 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ'—'পিতরৌ' হলো কেন, 'মাতা চ পিতা চ পিতরৌ'—একটি মাতা একটি পিতা—এটা হচ্ছে একশেষ দ্বন্দ্ব—'পিতা চ পিতা চ পিতরৌ' নয়।—'মাতা চ পিতা চ পিতরৌ—' পিতার মধ্যে মাতা ঢুকে গেলো। এগুলো বড়ো সুন্দর জিনিষ। মাতা লয় হয় পিতাতে। পিতা মাতাতে লয় হয় না। পুরুষের ভেতর প্রকৃতি অন্তর্গত হয়ে যায়। লীলার মধ্যেই লীলাতীত রয়েছে। কিছুই থাকে না, আবার সবই আছে—যখন যা চাইবে তুমি তখন সবই পাবে; স্ফুরণ হয় কিনা!

অধিমানস ও অতিমানস

২৬।১।৭৩ বিকেল ৩-৪৫ মিঃ। জিজ্ঞাসা ছিল অরবিন্দের Overmind এবং Supermind বুঝি না। ভালো করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তরে বাবা বলেছিলেন ঃ (সংক্ষেপে বলে দেই) মনের যে সাধনা হয়, culture—প্রথম সাধনা হয় কিসের থেকে ?—মনের থেকে। মনের বিকাশ হয় কিসের থেকে ?—প্রাণময় কোষ থেকে। প্রাণময় কোষ raw তারপর তাতে vitalisation হয় তারপর মনের স্ফুরণ হয় কিন্তু স্ফুরণ হলেই তাতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণটা আসে না। সেটা আসলে, আমাদের বিজ্ঞানময় কোষ খুললে শুদ্ধ সত্তগুণটা আসে কিন্তু centreটা খোলে না। তারপর আনন্দময় কোষটা আসে কিন্তু আনন্দময় কোষটা আসলেও সেটা কোষ। পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—আনন্দময় কোষ পর্যন্ত জীবের পূর্ণগতি হয়, কিন্তু তখনও সে জীব। তখন সে মুক্ত হয়ে যায় বটে কিন্তু পরমেশ্বরের ধারাতে ঢুকতে পারে না। জীব-ভাবই থাকে বটে তবে প্রাকৃত জীবভাব থাকে না, শুদ্ধ নির্মল হয়ে যায়। দেহ থাকে তখন কিন্তু মুক্ত হয়ে যায়। বিজ্ঞানময় কোষ খুললেই জীবন্মুক্তি হয়। আনন্দময় কোষও জীবন্মুক্তি—জীবন্মুক্তের দুটো অবস্থা। মনোময় কোষ আসলেই কর্মসংস্কার আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু প্রাণময় কোষে কর্মসংস্কার পাওয়া যায় না। এগুলো আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারার সার।

আর একটা জিনিষ আছে যেখানেতে তোমার যদি কেউ অপ্রাকৃত শক্তিযুক্ত থাকে অথাৎ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন হয় সেখান থেকে যদি জিনিসটা আসে অথচ প্রাকৃত জগতের জগতের ভিতরেতে সেখান থেকে আসে—মনে কর একজন পণ্ডিত মূর্খের অভিনয় করছে—একজন নিতান্ত মূর্খ যে তার মত হয়ে মূর্খের অভিনয় করছে, সে বাস্তবিক মূর্খ নয় অথচ অভিনয় করছে মূর্খের—তাকে তো মূর্খ বলতেই হবে অথচ সে মূর্খ নয়। এমন একটা অবস্থা আছে যখন নাকি জীব ভগবানের কৃপা পেয়ে যায় এবং সেই জীবকে দিয়ে ভগবান কিছু কাজ করাবেন—জগতের কাজ যেটা—ঐশ্বরিক কাজ যেগুলো—তখন তার ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তি প্রদান করেন। সেই শক্তিযুক্ত হয়ে সে যে কোন স্তরে অভিনয় করতে পারে। এই অভিনয়ের দুটো দিক আছে—একটা হচ্ছে

যে অভিনয় করছে সেটা সে বুঝতে পারে আর একটা অবস্থা আছে সে বুঝতে পারে না সে অভিনয় করছে। এই দুটো হল পঞ্চকোষের ধারা থেকে আলাদা। যেটা নাকি বুঝতে পারে না সে অভিনয় করছে অথচ সে higher levelএর সত্তাটি রয়ে গেছে অথচ সে সাধারণ levelএর জীব হয়ে অভিনয় করছে। সে নিজে বুঝতে পারছে না কিন্তু যে তাকে চেনে সে বুঝতে পারছে higher level এর। একটা অবস্থা হচ্ছে পণ্ডিত হয়ে মূর্খের অভিনয় করছে জেনেশুনে আর একটা অভিনয় হচ্ছে অজ্ঞানে আবৃত হয়ে অর্থাৎ তাঁর সত্তাটার বোধ ফোটে নাই। এটা পঞ্চকোষের বাইরে। পঞ্চকোষটা অভিনয় করা নয় সেটা শুধু করা। মনোময় কোষ এসে গেলে কর্ম করার অধিকার এসে গেল তারপর বিজ্ঞানময় কোষ এসে গেলে কর্ম করার থাকে না, জ্ঞান এসে গেল। তারপর আনন্দময় কোষ এসে গেলে আনন্দতে ডুবে গেলে তুমি—তারপর transcendent হয়ে গেলে—জীবন্মুক্ত হয়ে গেলে। এটা আলাদা লাইন—নীচের লাইন। আর ওটা হল কি কর্ত্তার লাইন। রাজার লাইন। এক জায়গায় রাজার ভাব এসেছে তাকে তা জানতে দেওয়া হয় নাই কিন্তু সে রাজা—(পঞ্চকোষের অন্তর্গত নয় সে) যে তাকে দিয়ে করাচ্ছে সে জানে সে অনেক উপরের অথচ অভিনেতা মনে করে সে সাধারণ জীব। আর একটা অবস্থা আছে সে নিজেই জানে সে নিজে অভিনয় করছে। এর ভিতরেই Supermind আর overmind এর difference আছে। Overmind হচ্ছে আবরণযুক্ত, এটা সাধারণ মন নয়—ভগবান থেকে আসা, আগতমন তাহলেও সেটা সে জানে না—সে ভগবান থেকে এসেছে এবং সেটা সে পেয়েছে সেটা সে জানে না। আর সে যখন নিজে জানে সব কিছু সেটা হচ্ছে supermind—মনই নয় সেটা—মনের কাজ করছে অথচ মন নয়—সেটা হ'ল divine power—divine power working through man, এটা হল supermind. এটা সংক্ষেপে বললাম। বুঝবার চেষ্টা কর পরে আবার বলব।

পঞ্চকোষের মধ্যে কর্ম করা হয় কিন্তু supermind এবং overmind-য়ে কর্ম নেই। Normal mindটা প্রাকৃত evolutionএর ফলে—matter থেকে evolve করতে করতে অন্নময় কোষ হয়ে প্রাণময় কোষ হয়ে মনোময় কোষে রূপান্তরিত হ'ল—তারপর বিজ্ঞানময় কোষে জ্ঞানের বিকাশ ঘটল কিন্তু প্রকৃত মুক্তি হল না। আনন্দময় কোষে মুক্তি হ'ল বটে কিন্তু ঈশ্বরত্ব আসল না—তিনি জীবই রয়ে গেলেন কিন্তু মুক্ত জীব। তারপর যখন দেহ ত্যাগ হয়ে গেল তখন অখণ্ড চৈতন্যের সঙ্গে যোগ হয়ে গেল। Supermind এবং overmind তা নয়—overmind হচ্ছে higher levelএ রয়েছে অর্থাৎ worldly mind

নয় সেটা—world থেকে transcend করে গেছে। তারপর কোন বিশেষ কারণেতে জগতে তাকে পাঠানো হয়েছে জগতের কাজের জন্য। কিন্তু সেটা তাকে জানতে দেওয়া হয়নি, তাকে জানতে দিলে আর তাকে দিয়ে জগতের কাজ করানো যাবে না কারণ সে করতে চাইবে না। আর supermind হ'ল ঐশ্বরিক শক্তি যুক্ত—divine power itself working through জীব। overmind আর supermind একই জিনিষ। overmind একটু নীচুস্তরের আর supermind উপরের স্তরের। এখানে evolution নাই। এটা mind হয়েও mind নয়।

স্বরূপদর্শন

আমার স্বরূপটা যখন দেখছি—নিজের মুখ যখন দেখছি আত্মদর্শন তো হয়ে গেল, তখন তারপরেতে জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপ যে সেইটাতে সমগ্র বিশ্ব—entire বিশ্ব দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সেখানেও থামবে না, বিশ্বাতীতে যাবে, তখন বিশ্ব নেই—বিশ্বাতীত যেটা হ'ল সেটার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে—তারপর শক্তির যখন নাকি সংকোচ হয়ে গেল—শক্তির অতীত অবস্থা যখন হয়ে গেল সেইটা হচ্ছে আত্মস্বরূপ অথচ প্রকাশস্বরূপ—শক্তি নাই সেখানে প্রকাশ রয়েছে। এইজন্য তোমাকে বুঝিয়েছিলাম সেদিন—যদি অন্ধকার ঘরেতে একজন লোক আসে—তখন ঘোর অন্ধকার অথচ সেই শরীরটিতে জ্যোতি নাই, আলো নাই, অথচ তার শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ সব দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা distinctly। সেটা কি ?—তার দ্বারা কি বুঝায় ?—তাকে দেখবার জন্য কিছুই দরকার হয় না—আলোর দরকার হয় না—জ্যোতির দরকার হয় না। সত্ত্বগুণেরও দরকার নাই—প্রকাশ নাই অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ, পরিষ্কার আলোতে তুমি যা দেখবে তার থেকে কোটি গুণ পরিষ্কার ভাবে দেখছ—বোধের এক একটি point পর্যন্ত তুমি দেখতে পাচ্ছ—সেইটার নাম প্রকাশ।—জ্যোতিটা থাকলে বুঝায় নির্মল সত্ত্বগুণ, তারপরেতে (নীচেতে) রজোগুণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সত্ত্বগুণের মিশ্রণ,—যাকে বলতেই হয় না কাউকে আমি ব্রহ্মস্বরূপ। আর জ্যোতি নিয়ে যেখানে আছে একটা খণ্ড—একটা নক্ষত্রের মত—সমস্ত ঘর আলোতে আলোকিত হয়ে গেল—স্নিগ্ধ আলো, চাঁদের আলো—পূর্ণিমার আলোও অত পরিষ্কার হয় না। এত সুন্দর এত স্নিগ্ধ আলো সেটা, সেটা হ'ল কি ? শুদ্ধ সত্ত্বগুণ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলে যেটাকে—সেটার নাম হচ্ছে চিৎশক্তি—মায়ের অঙ্গের আলো। যেটা প্রকাশ বল্লাম সেটা তা নয়, ওখানে মা নাই—ওটা হচ্ছে ব্রহ্মপ্রকাশ।

বারীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন : 'আমি দেখছি জ্যোতি বা নিজের চেহারা বা আত্মদর্শন তা'হলে এর মধ্যে দুটো বোধ রয়েছে না ?

বাবা বল্লেন : আমি যখন আমাকে দেখব তখন দুটো। কিন্তু দুটো তো একটাই—আমাকে দেখছ বল কি করে মূর্খের মত ? দেখছি—কি দেখছি,

কাকে দেখছি—সবসময় তিনটে থাকবে শুধু জগতের জিনিষে নয়—পরিপূর্ণ যেখানে সেখানেও থাকবে। থাকবে না কোনখানে ? স্বয়ংপ্রকাশ—একই এক, দ্বিতীয় কিছু নাই সেখানে। অথচ যদি ইচ্ছা হয় দেখবার জন্য তাতেই সব আছে। দুই থাকলে দুই বলে না। তিনি তো রয়েছেন একটা সেই বোধ থাকে—যেমন একটা বাষ্প, জল আর বরফ—তিনটে জিনিষ একটা শিশুও বলে কিন্তু একটু যার জ্ঞান আছে সে বলবে একটাই জিনিষ—বাষ্পই হোক্, জলই হোক্ আর বরফই হোক্— তিনটে অবস্থা। যখন তেজ বেশী প্রকাশ পায় তখন বাষ্পরূপে প্রতিভাত হয়, যখন বেশী ঘনীভূত হয় তখন ঠাণ্ডা হয়, বরফ হয়, আর মাঝখানে একটু গরম—তিনটে অবস্থা হচ্ছে—এটাও H_2O, ওটাও H_2O, একটাই জিনিষ। এ যেমন সাধারণ ভাবের কথা লোকে বুঝতে পারে না তেমনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এই তিনটে কোথায় ? একটাই জিনিষ। অবস্থার ভিন্নতাবশতঃ নাম আলাদা দেওয়া দরকার, বুঝবার সুবিধার জন্য।

বারীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন ঃ আত্মস্বরূপে শক্তির বিকাশটা যখন পূর্ণ হয়ে গেল ?

বাবা উত্তরে বললেন ঃ আত্মস্বরূপে শক্তির বিকাশ পূর্ণ হল না—আত্মস্বরূপে শক্তির বিকাশ যতটুকু সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশ করবার সেটা যখন হয়ে গেল, তারপরেতে যদি ঐখানেই থেকে যাও—থাকতে পারো। ইচ্ছা করলে ওকেও অতিক্রম করতে পারো। অতিক্রমের অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান্ এক হয়ে যায়—শক্তি শক্তিমানকে প্রকাশ করে না।—শক্তি আছে, শক্তিমান্ও আছে কিন্তু এক হয়ে আছে—একেবারে এক, তুমি যে আলাদা থেকে সেটা দেখবে, তা হবে না—একটা ঘটের মত পিণ্ড জিনিষ নয় যে সেটাকে দেখবে তুমি। তুমি নিজেই তো দেখবে—বোধ থাকবে—বোধস্বরূপই সে—পূর্ণ বোধ। এখন সেই অবস্থাটা তোমার যখন হ'ল তখন তুমি কি দেখবে, একটু কল্পনা করে নাও।

বারীনবাবু বল্লেন, প্রকাশ।

বাবা বল্লেন, তাকে দেখলে, না সেটা তুমি হয়ে গেলে ?—তুমি যখন বোধস্বরূপ হয়ে গেলে তখন কি দেখবে ?—তখন দেখবে এই জগতের যত বৈচিত্র্য সমস্ত নিয়ে অথচ সে একটাই—সে বৈচিত্র নয়—সে এক, অথচ অনন্ত তাঁকে আশ্রয় করে একটাই আছে, আশ্রয় করে ধর্ম-ধর্মীরূপে নয়, subject-object কিছু নাই, একই এক সে স্বপ্রকাশ বস্তু—সে মানে আমি। বাস্তবিক অদ্বৈততা তো চরম অবস্থা নয়—লোকে জানে না, বোকারা এটা

বলে···অদ্বৈতং কেচিৎ ইচ্ছন্তি চাপরে।' 'মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিতম্।' অদ্বৈত বললে সেটা তো limit হয়ে গেল—অদ্বৈত মানে—দ্বৈত নয়—অদ্বৈত, দ্বৈত, দুটো জিনিষ আছে তাতো নয়—সে এমন একটা অবস্থা তার বাইরে কিছু থাকে না—সবই এক—দ্বৈত বল, অদ্বৈত বল, দ্বৈতাদ্বৈত বল। রাম বল, শ্যাম বল, 'ক' 'খ' বল সবই আছে তার মধ্যে। কিন্তু এই, এই বললে limit করে দিলে সেটা। যা চাইবে তুমি তাই পাবে ···বলে না তপস্যা করে ঠাকুর সন্তুষ্ট হলেন এবং বল্লেন, তুমি যা চাইবে তাই তোকে দেব, বর নে, সেইরকম—কোন জিনিষটা আছে সেটা বলবার কিছু নাই, চাইলে সেটা পাবে।

বারীনবাবু বল্লেন ঃ 'আমি দুটো অবস্থার বোধটা বুঝতে পারছি না।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কোনটা বলো ?'

বারীনবাবু বল্লেন ঃ একটা হচ্ছে—যখন শক্তির অতীত অবস্থায় যায়নি—

বাবা বল্লেন ঃ শক্তির অবস্থা বুঝতে ভুল করেছ—শক্তির অবস্থা নয়—শক্তিটা যখন স্বরূপের সঙ্গে এক হয়ে গেল—শক্তির অতীত নয় সেটা—তারই তো শক্তি—সেই তো শক্তিরূপ হয়ে আছে সেই জিনিষটা—।

বারীনবাবু বল্লেন ঃ 'শক্তির যখন পূর্ণ বিকাশ হয়নি'—

বাবা উত্তরে বল্লেন ঃ না না না, যে ব্রহ্ম বা যা বল, পূর্ণ অবস্থাটা সেখানে শক্তি নাই, তা তো নয় কিন্তু শক্তি আছে বলতে পার না—শক্তিটা সেই স্বরূপের সঙ্গে এক হয়ে গেছে—আবার পৃথক হয়ে গেছে—সকল অবস্থা আবার নিষ্কল অবস্থা। এই দুটো মনে রাখলে clear হয়ে যাবে—শক্তি থাকবেই সব সময়ে—শক্তি যাবে কোথায় ?—যে শক্তি নিয়ে জগৎ আছে তাও আছে—সবই আছে। কিন্তু আছে বলতে গেলেই তো তাঁকে ছোট করে দিলে, আবার যদি না বল তাহলেও ছোট করে দিলে—এই ব্যবহারটাই চলে না—অব্যপদেশ্য।—যা আছে, তাই আছে এই পর্যন্ত। তারপর যে সেটা আছে সেটাও ভুল—আছে বলাটাও ভুল। অথচ নাইটা বলাও ভুল। অন্যজিনিষে যা শব্দ প্রয়োগ হয়, এখানে করতে গেলে তা limit হয়ে যায়—কিছু বলা যায় না—অব্যপদেশ্য বলেই এইজন্য—ব্যপদেশ করা যায় না কিছু—তখন describe করা যায় না, as this or that, কিছু বলা যায় না—সর্বাতীত বলে তাকে দেখে যে, তাতেও কুলায় না—সর্বটাও সে, আবার সর্বর প্রশ্নই যেখানে ওঠে না সেও সেই—আবার তাঁকে সে বলি কেন—সেও তো আমি—যখন অপরোক্ষ হয় তখন সেই তো আমি অথচ আমিত্ব নাই তাতে—এ এক অদ্ভূত জিনিষ—নিজে চিন্তা করলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে।

বারীনবাবু বলেন ঃ Differenceটা তক্ষাৎটা clear করে নিই—ব্যাপারটা হচ্ছে একত্ব বোধ, যখন পরব্রহ্মে যাইনি তখনও আমি আমাকে দেখছি। সে দুটো আমি একই—আমি আমাকে দেখছি এই দুটো থাকলেও এক বোধটা ভিতরে রয়েছে।

বাবা বল্লেন ঃ 'আমি আমাকে দেখছি এটা পূর্বেতে হতে পারে এটা সত্য কথা, এ জ্ঞানের অবস্থা। কিন্তু ব্রহ্ম যেখানে বলছি সেখানে আমিই আমাকে দেখছি, এ ভাব নাই।'

বারীনবাবু বললেন ঃ 'সেখানে বহু আছে কিন্তু একের মধ্যে—।'

বাবা বললেন ঃ সেখানে বহু আছে বলতে পার না,—এক আছে বলতে পার না, একানেক দুইয়ের অতীত—একের ভিতর দিয়ে গেলে (উঠবার) ঢুকবার সময়েতে—বহু ছিল, বহু থেকে একে গেলে, তারপরে একত্র থাকল না—তারপর এক থাকল না বলছি, এটাও থাকল না—এক থাকল না একথাও বলা যায় না। একটা হচ্ছে মহাশক্তি······এরা জগতে একের মধ্যে দুই, দুইয়ের মধ্যে এক।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রেম কি? কেউ কেউ বললেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেম। তার উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, একথা ঠিকই বটে কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মাতৃপ্রেম—মাতৃপ্রেম হচ্ছে মায়ের প্রেম সন্তানের প্রতি—সন্তানের প্রেম perfect হয় না। মা ছেলেকে ভালবাসেন তাতে নিজের কোন আস্বাদন থাকে না আর এখানে আস্বাদন রয়েছে—ভক্তভাবেই হোক আর গোপীভাবেই হোক, আস্বাদনটা রয়েছে। আস্বাদনটাই একটা মস্ত ভোগের জিনিষ। মানুষের মধ্যে সে জিনিষটা রয়েছে তো—সাধারণ মানুষের মধ্যে, আর সেই জিনিষটাই perfectionএর মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে—তাহলে তো বুঝাই যায় সে জিনিষ। আর এখানে কিছুই নাই—একেবারে নিঃস্বার্থ—কষ্ট ওখানেও আছে এখানেও আছে—ওখানে কষ্টের মধ্যে আস্বাদন আছে—তবে সে আস্বাদন ভাল আস্বাদন। Personally আমাদের হচ্ছে মায়ের দিকটা—সমস্ত বিশ্ব সন্তানরূপ—এ দৃষ্টিটাই তো সবচেয়ে ভাল। ওটা তো রাস্তাতে পাওয়া যেতে পারে।

জগদীশ্বর জিজ্ঞেস করল ঃ 'মা যে সন্তানকে কোলে করে আদর করছেন সেটা কি মায়ের দিকে কোন আস্বাদন হচ্ছে না?'

বাবা বললেন ঃ 'মায়ের আস্বাদন কিছু নাই—মা দুঃখ এবং সুখ সবের মধ্যে এক ভাবেতে আছেন। হাজারও দোষ করুক, যত কিছু করুক সেখানে প্রশ্ন কোথায়? ছেলে যদি অযোগ্য হয়, হাগে, মোতে, প্রস্রাব করে, মা

সেখানেতে বিরূপ নয় যদি প্রকৃত মা হয়—বিশ্বটা দেখবে তো সেইভাবে। আমার ভিতর হাজারও দোষ আছে, থাকতে পারে কিন্তু আমার দোষের জন্যই যদি বঞ্চিত হই—তিনি স্বয়ং পূর্ণ—পূর্ণ আনন্দ—তিনি তো আনন্দময়ী। আস্বাদনের question কোথায় সেখানে? Questionটা হচ্ছে আস্বাদন পাওয়াটা সেই ব্যাপারেতে—সেই মা ভাল, শ্রেষ্ঠ। আমি বোধহয় লিখেছিলাম 'সাহিত্য-চিন্তা'র 'ত্রিবেণী সঙ্গমে'—'বসন্ত-প্রয়াণে'র পরে 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' লেখেন রবীন্দ্রনাথ। 'ত্রিবেণী সঙ্গম'টার আলোচনা আমি করেছিলাম আর কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন 'সাগর সঙ্গীতে' চিত্তরঞ্জন দাস, যেটা তত সূক্ষ্ম নয়। শিশুদের কথাই তো কাজেই মা'টাই ভাল। তারপরে চিন্ময় ব্যাপার যেটা সেটা তো নিত্য লীলার ভিতরে। আমাদের দিক্ থেকে দেখতে গেলে মাতৃভাবটাই হচ্ছে ভাল।

হেমেনদা জিজ্ঞেস করলেন: 'মাতৃভাবে সন্তানের কিছু কর্তব্য থাকে না তো? শরণাগতি ভিন্ন!'

বাবা বল্লেন: 'মাতৃভাবে সন্তানের কর্ত্তব্য থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে—সন্তান যদি খারাপ হয় মা তো তাকে ছাড়তে পারেন না।'

হেমেনদা বল্লেন: 'তবু সন্তানকে শরণাগত হতে হবে তো?'

বাবা বল্লেন: 'এ তো অন্যদিক দিয়ে নিয়ে গেলে কথা—এতো অন্যকথা হয়ে গেল। সন্তানের শরণাগতি মানে কি?—মাতৃভাব নিয়ে কথা হচ্ছে এখানেতে সাধনাতে কে কোথায় যাবে, কি অবস্থায় যাবে, তা বলা হচ্ছে না—মাতৃভাব। প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মাতৃভাব এই নিয়েই কথাটা উঠছে—মাতৃস্নেহটা তো পাবোই বা কোন সময় বলো! এগুলো তো সব সম্প্রদায়ের কথা। মানুষের experienceএর থেকে বুঝা যায়—মায়ের ভালবাসা সবচেয়ে ভাল। শরণাগতি যখন এসে যায় তখন কি হয় সেটা—মাতৃভাবই তো হয়। তখন কি পুরুষভাব থাকে—পুরুষভাব তো পুরুষকার—নিজের question তখন ওঠে না—ভাব দিয়ে questionটা বুঝতে হবে।

জগদীশ্বর আবার প্রশ্ন করল: 'আস্বাদনের point of view থেকে আমার মনে যেটা জেগেছিল আর কি, human experience যেটা, মা যখন কোলের ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে তখন কি আস্বাদন হয় না মায়ের?"

বাবা বল্লেন: "সমস্ত বিশ্ব যেখানেতে সন্তান সেখানেতে মানুষের কথা ভাবছ কি করে?"

তারপর বল্লেন: Indian philosopherরা যে ভাবেতে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করছে সেটা আমার মনে হয় সন্তোষজনক নয়;—তবে

Indian Philosophy

বলবে কি ভাবে হওয়া উচিত ? উত্তর হচ্ছে, Indian philosophyর বৈশিষ্ট্য কি দেখানোর চেষ্টা করা each from his point of view—তার জন্য কতকগুলো common factors থাকবে, তাতে কর্মবাদ মানতে হবে এমন কোন কথা নাই বা তাতে ঈশ্বরবাদ মানতে হবে এমন কোন কথা নাই—যে কোন দিক্ বা stand point নিক্ না কেন কিন্তু তার backgroundএ common pointটা থাকবেই। সেটা হওয়া চাই। যেমন আমি বল্লাম আমাদের প্রাচীনকালে মহিম্নঃ স্তোত্রের মধ্যে যেটা প্রস্থানভেদ বলেছেন, ত্রয়ী সাখ্যং যোগঃ পশুপতিমতম্ বৈষ্ণবম্ ইতি, প্রভিন্নে প্রস্থানে—প্রস্থান-ভেদ সেগুলো······বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত, বৈষ্ণবমত ইত্যাদি—কারও এটা ভালো লাগে, কারও কাছে অন্যটা ভাল লাগে—যে জায়গাতে আছে তাকে সেখান থেকেই চলতে হবে—'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ'—মানুষের রুচি বিচিত্র, সেজন্য সকলে আপন আপন পথ ধরে চলে, কিন্তু যে পথ দিয়েই যাক না কেন জন্মস্থানের, কিন্তু জন্ম সমুদ্র যেখানে—যে ধারা নিয়েই যাক্ সব নদীর ধারা সব নদীই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে—এই যে তুমি এই তুমিটাকেই চাই—যে তুমি ঈশ্বর বলো—মা বলো, মহাশক্তি বলো, যা কিছু বলো, তাহলেই সে আস্তিক হয়ে গেল, সে ঈশ্বর মানুক্ বা না মানুক্ তাতে এসে যায় কি ? সাংখ্য এক ভাবেতে দেখেছে—মীমাংসা এক ভাবেতে দেখেছে—ন্যায়ের গৌতম ঋষি ছিলেন—বৈশেষিকের কণাদ ঋষি ছিলেন—সাংখ্যের কপিল ঋষি ছিলেন—সিদ্ধপুরুষ ছিলেন—পতঞ্জলি, তিনিও ঋষি ছিলেন—সকলেই তো ঋষি—কাকে ছোট করবে ? কিন্তু সাধনা আলাদা আলাদা। ন্যায়-বৈশেষিকের অসৎ কার্যভাব—কার্য্যটা ধ্বংস হয় আবার সৃষ্টি হয়—বিশ্বে এইরকম ধ্বংস আছে সৃষ্টি আছে, creation আছে, destruction আছে,—ব্যষ্টিভাবেও আছে, আবার সমষ্টিভাবেও আছে। সাংখ্য বল্লেন, না, সৃষ্টি বলে কোন জিনিষ নাই—creation বলে কোন জিনিষ হয় না—যেটা আছে সেটা সেইরকমই আছে—আমরা যাকে সৃষ্টি বল্লাম, তার পূর্বেও ছিল এবং যাকে ধ্বংস বলছি তার পরেও থাকে—এজন্য অসৎকার্যবাদ নাই,—সৎকার্যবাদ। তারপরে বেদান্ত বল্লেন, কার্য অসৎও নয় সৎও নয়, কার্যটা হচ্ছে অনির্বচনীয়—মায়াবাদ এল তার ফলে। ভিন্ন ভিন্ন রকম আছে। সবগুলোই তো একটা, শুধু stand-point আলাদা—কেউ একতলা থেকে দেখছে, কেউ তেতলার উপর থেকে দেখছে। ট্রেন আসেনি—রওনা হয়েছে—ট্রেনটা আসেনি যখন, তখন তো সেখানে non-existent কিন্তু already রওনা হয়েছে—আছে তো—খানিকক্ষণ

পরে এসে যাবে। এইভাবে দেখলে সবগুলো standpointএর সমন্বয় হয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে আমাদের Indian outlook। কাজেই তার মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ, নাস্তিক সবই তো রয়েছে ও সব দর্শনের একসঙ্গে সমন্বয় হয়। সকলেই তো কর্ম মানছে, সেখানেতে যে কর্ম মানছে না সে কর্মস্থানে অন্য জিনিষ মানছে, সেই জিনিষটা দরকার হয়—সেটা কোথায়—সেটা এদের মধ্যে নাই। সুখ দুঃখ কেন হয়—কেন হয় এরা বলছে, world forcesএর actionএর জন্য হয়—তাতে মানুষের নিজের moral life এর সঙ্গে কোন connection নাই। আমি জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি, কিছু একটা আছে যেটা আমার সঙ্গে connected—আমি কোন ত্রুটি করেছিলাম, আজ না হয় লক্ষ বছর পূর্বে, তার জন্য আমাকে ভুগতে হয়, জোর করে কিছু হয় না তার একটা Justification আছে—Justice তো আছে—তারপর যখন দৃষ্টি খুলবে তখন দেখা যাবে there is Love···মা যেমন ছেলেকে মারে, সে মারটাও যেমন মারা, তাহ'লেও তার একজায়গাতে ভালবাসা আছে, সে দৃষ্টি নিয়েও তো দেখতে পারে সে জিনিষটা, কাজেই সব জিনিষগুলোই আমাদের ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা মেনে নিয়েছে,—আস্তিক, নাস্তিক কিছুই নাই, Indian—Indian দের ভিতরেতেও নাস্তিক ছিল না, তা নয়—নাস্তিক ছিল, চার্বাক ছিল—চার্বাককেও খণ্ডন করেছে—বৌদ্ধরা চার্বাককে খণ্ডন করেছে। জৈন যে তারাও চার্বাককে খণ্ডন করেছে, বেদান্তও করেছে কাজেই সেটা স্থান পায়নি এখানে এটাই আমার বলার উদ্দেশ্য। সে জিনিষ তখনও ছিল, এখনও আছে কিন্তু—সে জিনিষ আমরা accept করি না। এগুলো হয়নি কি? এখানে হয়েছে, কিন্তু টি'কতে পারেনি—জৈনরাও তাদের টিকতে দেয়নি—তাদের প্রাচীন literature প্রাকৃত ভাষায় রয়েছে তাতে সব দেখতে পাওয়া যায়, সেরকম বৌদ্ধদের মধ্যেও আছে, তারাও খণ্ডন করে গেছে। আমাদের তো কথাই নাই, এযে সবটা নিয়ে যে viewpoint। এটাই হচ্ছে আমাদের আস্তিক্য viewpoint। এটাই হচ্ছে Indian philosophy। Atheism, নাস্তিক্যবাদ কখনও হয়নি তা নয় কিন্তু কখনও স্থান পায়নি, সেটা দেখতে চেষ্টা করলে একটা আনন্দ হয়। নিজের একটা জিনিষ আছে। আরও যদি এগিয়ে দেখতে পার তা হ'লে Indian philosophy, Greek philosophyর মধ্যে কোন difference বা ভেদ নাই—সবগুলোরই এক একটা দিক রয়েছে—দুটোর সমন্বয় করে দাও—সে অনেক পথ রয়েছে। আমি অনেক কাণ্ড করেছি একসময়। সবরকমই হতে পারে। কিন্তু Indian philosophy বলতে গেলেই Indiannessটা তাতে আছে কিনা দেখতে হবে। ঈশ্বর মানলেই

যে Indian philosophy হয়, তা তো নয়—ঈশ্বর না মেনেও তো Indian philosophy রয়েছে এবং ষড়দর্শনের মধ্যেই তো রয়েছে—তাতে কি Indian philosophy হয় না ? কাজেই Indian philosophyর বৈশিষ্ট্য কি ? এগুলো দেখতে হবে।

বারীনবাবু বল্লেন ঃ Indian Philosophyর বৈশিষ্ট্য আস্তিক্য বুদ্ধি !

বাবা বল্লেন ঃ ,আস্তিক্য মানে কি ? আস্তিক আর নাস্তিক—নাস্তিক কাকে বলে ?' বাবা বল্লেন ঃ যারা বলে জগতের backgroundএ একটা সূক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়া করছে এবং সেটা জগতের মঙ্গলের জন্য। বারীনবাবু বল্লেন ঃ 'চৈতন্য'। বাবা বল্লেন ঃ 'শক্তির সঙ্গে যোগ না হলে চৈতন্য হয় না। চিৎ আলাদা, চৈতন্য—আলাদা। চিৎ সবসময় থাকে।'

জগদীশ্বর বল্ল ঃ যারা ভগবান বিশ্বাস করে না অথচ মানুষের বিকাশের কথা বলে ?

বাবা বল্লেন ঃ বিকাশের অর্থ কি ? মানুষের আবার বিকাশ কি ?

জগদীশ্বর উত্তরে বল্ল ঃ জাগতিক বাধা-বিপত্তির অপসারণ !

বাবা বল্লেন ঃ আমরাও তো তাই বলি—সেকথা সকলেই বলে—আমরা scienceএর কত কিছু advantage নিচ্ছি তো—সেটা অস্বীকার কে করছে ? লক্ষবার স্বীকার করছি। কালের মধ্যে থাকলে কি মানুষের বিকাশ হয় ? মৃত্যুকে জয় করতে না পারলে কিছুই হবে না—এটাই হচ্ছে আসল কথা। বাবা বল্লেন ঃ কাল তো রয়েছে—কালকে কি করছে ?...তারপর মানুষ মরে গেলে নিত্যধাম পাবে, সেটা তো ঠিক কথা—একটা আশা রয়েছে মনে—তারপর এখন বলছে জগতেই তো কালের জয় হবে। অরবিন্দ যেমন বলেছেন—সবই তো Indian philosophyর ভিতরে—বাইরে কিছুই নাই—Soviet way of thinkingএর মধ্যে কিছুই পাচ্ছ না—লৌকিক ভাবের বিকাশটা হয়েছে—এগুলো আলোচনা করে শুধু সময় নষ্ট করা। অন্যান্য philosophy না পড়লেও তার viewpointটা তো জানা আছে। আস্তিক্য বুদ্ধি থাকা চাই—একটা সত্য জিনিষ আছে এবং সে নিত্য এবং সে মানুষের পরমকাম্য। সেটা যেভাবেই হোক্—এর মধ্যে নানা approach আছে। সেটা তো তারা মানে না—সে জিনিষটা মানে না।

জগদীশ্বর উত্তরে বল্ল ঃ তারা মানুষকে মানে তো ?

বাবা বল্লেন ঃ মানুষকে মানে অর্থ কি ? সময়ের প্রভাবটা অতিক্রম করা উচিত তোমাদের—অতিক্রম তোমরাও করতে পারনি। আমিও করতে পারি নি—কিন্তু আমার লক্ষ্যটা একদিকে রয়েছে। তোমাদের লক্ষ্যটা অন্য দিকে

রয়েছে—চৈতন্য থেকে matter হয়। আবার matter থেকে চৈতন্য হয়—দুটো একটাই জিনিষ—মূলে তো একটাই জিনিষ—দুটো জিনিষ কোথায় ?

বারীনবাবু বল্লেন, science বলে তাদের যে আবিষ্কার, সেটা সমষ্টি পাচ্ছে, আর এ পথে পায় শুধু ব্যষ্টি।

বাবা বল্লেন ঃ এটাও সমষ্টির জন্য যখন হবে তখন তাই হবে—পণ্ডিচেরীর Mother এত কথা বলেছেন, অরবিন্দ এত কথা বলেছেন, আমাদের গুরুদেবও বলেছেন, অন্যান্য মহাপুরুষরা বলেছেন। তাঁরা তাঁদের ভাবে রয়েছেন—তুমি তোমার ভাবে দেখো। ভগবান নিজেকে নিজের ভাবে প্রকাশ করেন। বাবা বল্লেন ঃ ভগবানকে প্রকাশ ভগবানই না করতে পারেন। তাঁকে আপন করে নিতে হবে। সেই হ'ল জীব—সেও তো ভগবান কিন্তু সে পায়নি—অভাবগ্রস্ত—এক দিচ্ছেন যিনি তিনি হচ্ছেন গুরু আর যেটা দিচ্ছেন সে হ'ল ইষ্ট। খেলা—শিষ্য-গুরু-ইষ্ট। নিজেকে দিচ্ছেন গুরু, প্রকাশ করছেন সেই ইষ্ট।

পূর্ণ প্রজ্ঞার বিকাশ

দেহে যে nervous system আছে এবং আরও যে vital tissues আছে যা function করে, তাতে আমাদের consciousnessএর সঙ্গে connected will-power প্রভৃতি, এই সব শক্তি ওকে সাহায্য করে—কিন্তু যে সময় এই সব withdrawn হয়ে যায়—সমষ্টি অবস্থা বল আর যে অবস্থাই বল সব withdrawn হয়ে যায়—আমাদের সাধারণ অবস্থায় যখন জাগতিক ব্যবহার করি আমাদের current সব অধোমুখী থাকে কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী করার আমরা চেষ্টা করি। যে অবস্থায় current ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায় ঐ সময় নীচের যত নাড়ীচক্র আছে তা তখন শক্তি পায় না কেননা current তখন ঊর্ধ্বমুখী—ঊর্ধ্বমুখী current হলে ইড়া পিঙ্গলা function করে না—সুষুম্না function করে—সুষুম্নার branches function করে, যখন ঊর্ধ্বস্রোত চলে। বুদ্ধদেব এই অবস্থাকে স্রোতাপন্ন অবস্থা বলতেন। এই সময় দেহের consciousness থাকে না। তারপর ওখান থেকে current যখন ফিরে আসে এবং দেহের consciousness ফিরে আসে, ego এসে যায়—দেহাত্মবোধ ফিরে আসে। সে সময় বাহিরের ইন্দ্রিয়ের function শুরু হয়।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থায়, এইভাবে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের স্থূল দেহ কাজ করে।

স্থূল দেহে ইন্দ্রিয় কাজ করে—ইন্দ্রিয়ের মারফৎ বাইরের বিষয়ের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়—বহির্জগতের সঙ্গে connection এসে যায়—বহিরাকাশের এই সময় জ্ঞান থাকে। স্বপ্নাবস্থায় ইহা withdrawn হয়। অন্তর্মুখ হয়ে যায় কিন্তু এ জগতের সংস্কার থেকে যায়—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথচ ইন্দ্রিয়হীন অবস্থার অনুভব হয় এই স্বপ্নাবস্থায়—এসব ইন্দ্রিয়ের সংস্কার দ্বারা হয়। এই ক্রিয়া যখন হয় তখন বহিরাকাশের সঙ্গে কোন connection থাকে না। এ সব হয় চিত্তাকাশে—এও এক আকাশ। কিন্তু যখন স্বপ্ন থেকে সুষুপ্তি অবস্থা আসে, গাঢ় নিদ্রা হয় তখন বহিরাকাশ অন্তরাকাশের অর্থাৎ বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের সম্বন্ধ থাকে না—সংস্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না—সব কিছু শান্ত হয়ে যায়—এই অবস্থাই নিদ্রাবস্থা, সুষুপ্তি অবস্থা। এই সময়ে sensory nerveএর fnnction থাকে না,—শান্তি থাকে, অজ্ঞান (অবস্থা)

৪

থাকে। জীবন-যোনি প্রযত্ন যাকে বলা হয় অর্থাৎ vital impulse, ঐ অনু-সারে সুষুপ্তি অবস্থা ভেঙ্গে যায়। চক্র ঘুরতে থাকে—আবার জাগ্রৎ অবস্থা আসে, স্বপ্ন আসে, সুষুপ্তি আসে, এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে। জ্ঞানীর এইরকম অবস্থা হয় না—সুষুপ্তির অবস্থারও জ্ঞান আসে, কখন? অজ্ঞান যখন না থাকে তখন জ্ঞানের প্রকাশ হয়—সুষুপ্তির অন্ধকারে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। জ্ঞান হলেই এর উপরে ওঠে—জ্ঞান ক্রমশঃ তীব্র হয়ে যায়, তখন current ঊর্ধ্বমুখী হয়—তখন বাইরের জগতের জ্ঞান থাকে না, স্বপ্ন জগতেরও জ্ঞান থাকে না—এক কল্পনাশূন্য current থাকে ঊর্ধ্বমুখী, এই জ্ঞান স্থায়ী হলে ঊর্ধ্বমুখী current থেকে যায়, সামান্য অধোমুখী current আসে ব্যবহারের জন্য—এই হল জীবন্মুক্তদের অবস্থা। ব্যবহার দেহ থেকে করে কিন্তু জ্ঞান থাকে। কিন্তু যদি তীব্ররূপে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যায়, তাহ'লে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা এসে যায়, কেবল ঊর্ধ্বমুখী current কাজ করে। এই সময়ে পূর্ণ প্রজ্ঞার উদয় হয়ে যায় এবং ঊর্ধ্বমুখী currentএ উপর থেকে অধোমুখী current এসে মিলে যায়—এরই নাম হচ্ছে আনন্দময় কোষ—আনন্দের উদয় হয়—এ জাগতিক আনন্দ নয়—ঊর্ধ্বমুখী current তো থাকেই কেননা মাধ্যাকর্ষণ তো অতীত হয়ে গেছে এবং ওখান থেকে অধোমুখী current থাকে, প্রেম, করুণা, কৃপাবলে আসে এবং দুইএর যোগ হয়ে যায় এবং আনন্দ উপলব্ধি হয়—ওখানে বিষয়ের প্রয়োজন নেই অথচ আনন্দই আনন্দ এবং এটা তীব্র রূপে হলে শরীরে weight থাকে না—শরীর ঊর্ধ্ব-মুখী হয়ে যায়—কেউ কেউ একে levitation বলেন। আর এতটা না হলে ঊর্ধ্বমুখী বেগ থাকে এবং আনন্দের অনুভব হয়। আর যখন আনন্দময় কোষ ভেদ হয়ে যায় ঐ সময় যে আনন্দ থাকে তাতে কোষ থাকে না—স্বরূপে প্রবেশ হয়ে যায়। ঐ সময়ে শক্তির স্বাতন্ত্র্য অবস্থা আসে—ঐ সময় আপন শক্তিকে control করবার ক্ষমতা আসে—ঐ অবস্থা self-consciousness অবস্থা—ঐ অবস্থায় বাহিরের জ্ঞান থাকে। জাগতিক ভাবে বা ব্যবহারিক জগতে হাসিঠাট্টা করলেও আপন স্বরূপ স্থিতি বিঘ্নিত হয় না। এই অবস্থায় স্থিতি হয় আর লক্ষ্য আমাদের হচ্ছে তো পূর্ণ প্রজ্ঞার বিকাশ—যখন পূর্ণ প্রজ্ঞা খুলে যাবে তখন সব ঠিক হবে, তখন তো কোন কথাই থাকবে না।

আবরণ উন্মোচন

তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপন করে না নেন ততক্ষণ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হ'ল কোথায় ? গুরু সব সময় পিছনে থাকেন আর ইষ্ট থাকেন সামনে। যেমন রাখাল বালক পিছনে goad করে, গরুবাছুর তার সামনে যায়। গুরুও সেই রকম, জিনিষ তো একটাই, গুরু পিছন থেকে drive করেন, পরিচালনা করেন। ব্যাবহারিক যে গুরু—সে গুরু আসলে ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়—এই conceptionটা কর্মের অতীত অবস্থা—তাঁকে পাওয়ার জন্যই তো সব কিছু করা। সুতরাং গুরু যে আত্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ তাতে কোন ভুল আছে ? ষোল আনা তত্ত্বকথা এতে কোন ভুল নেই। সুতরাং যতক্ষণ দেহাত্মবোধ থাকে সে গুরু হ'তে পারে কি ? কিন্তু ব্যবহার জগতে পরম্পরা রাখবার জন্য দরকার হয় সেটা।

আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ করে আগম শাস্ত্রে খুবই আলোচনা আছে—অজ্ঞানটা হচ্ছে দুই রকমের—একটা পৌরুষ অজ্ঞান আর একটা বৌদ্ধ অজ্ঞান। পৌরুষ অজ্ঞান হচ্ছে পুরুষ বা আত্মাসংক্রান্ত অজ্ঞান—নিজের স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান আর বৌদ্ধ অজ্ঞান হচ্ছে যেটা বুদ্ধিকে touch করে, স্বরূপকে touch করে না। তবে গুরুশক্তির দ্বারা তখন হয় কি—প্রকৃত যদি গুরু হয় তবে পৌরুষ অজ্ঞানটা নিবৃত্ত হয়ে যায়—পৌরুষ অজ্ঞান লৌকিক ব্যবহার দ্বারা কিছু আসে যায় না।—পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত করলেও বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। আমাদের আগমশাস্ত্রে বলেছে যে প্রত্যেকটি জীবই আণবমলযুক্ত—তিনটে আবরণ রয়েছে—একটা আণবমলরূপ আবরণ, একটা মায়ার আবরণ, আর একটা হচ্ছে কর্মের আবরণ। আমাদের নীচের থেকে যদি দেখা যায় তাহলে শুধু প্রকৃতি এবং পুরুষের ভেদ রয়েছে—প্রকৃতি আমি—উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত এটা তো একটা অজ্ঞানের কারণেতে হয়—সেই অজ্ঞানটা আবরণ একটা—সেই আবরণটা যদি কেটে যায় তাকে বলে বিবেকখ্যাতি সেই জিনিষটা—বিবেক জ্ঞানটা কখন উৎপন্ন হয় ? অধস্তন প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বুদ্ধি—বুদ্ধি দিয়ে মনে করে যে আত্মা এটা তো পৌরুষ অজ্ঞান অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি থেকে separate না হবে—আমি আলাদা, প্রকৃতি আলাদা এই যতক্ষণ পর্যন্ত

জ্ঞানেতে আমি না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি-সম্পর্কজনিত যে অজ্ঞান সেটা নিবৃত্ত হয় না। এইজন্য বিবেকখ্যাতি দরকার, বিবেকজ্ঞান মানে sense of discrimination between প্রকৃতি and পুরুষ—সেইটা যখন হয়ে যায় তখন প্রকৃতি আলাদা হয়ে যায়, পুরুষ আলাদা হয়ে যায়—এখন পুরুষ প্রকৃতি মিশে রয়েছে,—আলাদা হয়ে গেলেই তার নাম কৈবল্য। কেবল জ্ঞান —কৈবল্য অবশ্য অনেক রকমের আছে। তারপর আমাদের শাস্ত্রে বলেছে যে এই কৈবল্যটাও পূর্ণ নয়—পুরুষের নিজের purityটা recover করা—প্রকৃতির আবরণটা একটা impurity সেটা চলে গেল আমি যেমন তিনটে জামা পরে আছি—কোট, সার্ট, গেঞ্জী—আমি প্রথমে কোট খুললাম, তাতেও আমি মুক্ত হলাম না, তারপর আমি সার্ট খুললাম, তাতেও আমি মুক্ত হলাম না, তারপর আমি গেঞ্জী খুললাম তবে আমি মুক্ত হলাম এও ঠিক সেই রকমের। প্রকৃতির আবরণ যখন সরে যায় তখন পুরুষ to a certain extent মুক্ত হ'য়ে শুদ্ধ হয়ে গেল, একে কৈবল্য বলে। কিন্তু শাস্ত্রে বলছেন যে আর একটা আবরণ আছে, সেটা হচ্ছে মায়াবরণ—প্রকৃতি এবং মায়া এক হলেও ঠিক এক নয়—একটু পার্থক্য আছে—প্রকৃতির মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে, মায়াটা শুধু আবরণ করে সেখানেতে। বেদান্তে যেমন মায়া আছে—দুটো একই জিনিষ, তাহলেও একটা সূক্ষ্মতর অবস্থা মায়াটা, 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'। তারপরে মায়া থেকে সরে যায়—মায়া থেকে যখন পুরুষ আলাদা হয়ে যায় তখন তার purityও আরও pure হয়ে গেছে। একটা আবরণ সরে গেছে,—আর একটা আবরণ তো রয়ে গেল। সেই আবরণটা হচ্ছে আণবমল। পুরুষের যে আবির্ভাব চিদণু সেই যে spiritual atomicity, সেটা নষ্ট হয় না—ব্রহ্মস্বরূপ হলে সে কি হবে—ব্রহ্মস্বরূপ হলে সে মায়ার অতীত হয়ে গেল। মায়ার অতীত—মহামায়ার অতীত হয়ে যায় সে, অথচ অদ্বৈত হয় না।

তীর্থ

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে তীর্থদর্শনের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং তীর্থের নানা মাহাত্ম্য কীর্তন করা হ'য়েছে। তীর্থের আসল রহস্য কি, যদি একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন তো অনেকের বড় উপকার হয়।

উত্তর ঃ সাধারণতঃ আমরা তীর্থ বলতে কি বুঝি ? আমরা মনে করি বৃন্দাবনধাম একটি তীর্থস্থান, প্রয়াগ একটি তীর্থস্থান, পুরুষোত্তম পুরী একটি তীর্থস্থান, কাশীধাম একটি তীর্থস্থান, ভুবনেশ্বর একটি তীর্থস্থান—এইরকম বহু তীর্থস্থান আছে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানকে পবিত্র মনে ক'রে তীর্থ এই নামকরণ করে থাকি। এই হ'ল তীর্থের মোটামুটি কথা। কিন্তু তীর্থ শব্দের অর্থটা কি, জানতে হ'বে। তীর্থ বলতে বুঝায় 'তৃ' ধাতু থেকে তীর্থ হয়েছে।—'তৃ' ধাতুর মানে তরণ বা উত্তরণ অর্থাৎ যা'র সাহায্যে আমরা কোনো একটি দুর্গম কোন একটি নদীর মতন, কোন একটি বা আবরণ, সঙ্কট উত্তীর্ণ হ'তে পারি, সেইটাই হ'চ্ছে তীর্থ। এজন্য নদীর তীর্থ বলি কোন্‌টা ? যেটা ঘাট। এজন্য Oxfordকে বড় বড় মহাত্মারা translation করেছেন উক্ষতীর্থ। নদীর যেটুকু fordable, যেখান দিয়ে মানুষ পার হ'তে পারে, সেটাকে বলে তীর্থ। এক পার থেকে আর এক পারে ত'রে যাওয়া, সেটাকে বলে তীর্থ। এক পার থেকে আর এক পার যাওয়ার নামই হচ্ছে তরণ অর্থাৎ পাড়ি দেওয়া, এক পার থেকে আর এক পারে যাওয়া। যা'র সাহায্যে পাড়ি দিতে পারে কোন একটা দুর্গম বা দুরতিক্রম্য ব্যবধান অর্থাৎ তা' কাটিয়ে যেতে পারে সেটাই তীর্থ।

সেই হিসাবেতে আমার গুরু হচ্ছেন তীর্থ, কেননা গুরুর সাহায্যে আমরা ভবসমুদ্র পার হয়ে যেতে পারি। সংসার উত্তীর্ণ হয়ে যাই তাঁর সাহায্যে। এইজন্য গুরু হচ্ছেন তীর্থ। এইজন্য একই গুরুর যদি পাঁচ-জন শিষ্য হয় তা'দের বলা হয় সতীর্থ অর্থাৎ সমান তীর্থ যা'র অর্থাৎ একই গুরুর শিষ্য। তাই তীর্থ শব্দটা গুরু অর্থেও ব্যবহার করা যায়। তা' হ'লে বুঝতে হবে, যিনি উত্তীর্ণ ক'রে দেন অথবা উত্তীর্ণ হ'তে সাহায্য

করেন অথবা যা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে সাহায্য পাওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে তীর্থ। এটাই হ'চ্ছে আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদের মত বা ধারণা।

মহাভারতের শান্তিপর্বে এক জায়গায় বর্ণনা আছে যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান সমস্তই ত্রিগুণের মধ্যে তো, তা'হলে যেখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে, সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকার দরুণ তা'র একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং বৈশিষ্ট্যবশতই ঐ স্থানকে আমরা তীর্থ বলে মনে করি। সেই সত্ত্বগুণ সব জায়গায় সমানভাবে থাকে না, কেননা প্রকৃতির সবই ত্রিগুণের দ্বারা রচিত। তা' সত্ত্বেও কোথাও সত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, কোথাও রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, কোনো জায়গায় তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। এই যে সত্ত্বের প্রাধান্য এ-ও দুই রকমের—এক হ'চ্ছে স্বাভাবিক, আর এক হ'চ্ছে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাতে সত্ত্বগুণের আধিক্য রয়ে গেছে—কেন থাকে সে আলাদা কথা, সে-কথা পরে বলব।

প্রত্যেক জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, মানুষের চিত্তের বৃত্তি—সকলের মধ্যেই ত্রিগুণের বিভাগ আছে—কোনটাতে রজোগুণের, কোনটাতে তমোগুণের এবং কোনটাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য। আবার সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের ভিতরেও আপেক্ষিকভাবে কোথাও সত্ত্বগুণ, তমোগুণ, রজোগুণ, সত্ত্বগুণের মধ্যেও আবার সত্ত্বগুণ আছে। গুণবিভাগ নিয়েই সৃষ্টিটা কিনা, কাজেই সব জায়গায় ত্রিগুণ থাকবেই। থাকলেও সত্ত্বগুণ যেখানে বেশী পরিমাণে থাকে সেখানে তা'হলে তার প্রভাবটা পাওয়া যায় এবং তা'র প্রভাবের দ্বারা মানুষের দেহ মন সব কিছু শুদ্ধ হ'য়ে যায়। এইজন্য তীর্থ শব্দ সেটা বুঝাচ্ছে যেস্থানে অথবা যে পুরুষেতে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে এবং যা'র সাহায্যে মানুষ অতি দুরতিক্রমণীয় যেকোনো একটা ব্যবধান সেটা অতিক্রম করতে পারে। সবচেয়ে বড় ব্যবধানই হ'চ্ছে সংসার এবং সংসারকে অতিক্রমের সাহায্য পাওয়া যায় সত্ত্বগুণের সাহায্যে যে জায়গা থেকে, সেটাই হ'ল তীর্থ।

এটা বললাম স্বাভাবিক দৃষ্টি হ'তে। যেমন জীবের মধ্যেও কোনো জীব আছে স্বভাবতই সত্ত্বগুণপ্রধান, আবার কোনো জীবে রজোগুণ বা তমোগুণ প্রধান। এইরকম যেমন আছে, এটাও যেমন সত্য তেমনি অন্য বস্তুর মধ্যেও, ফুল-ফল, লতা-পাতা সব জিনিষের মধ্যেও কতকগুলো সত্ত্বগুণ-প্রধান, কতকগুলো রজোগুণ প্রধান, কতকগুলো তমোগুণ প্রধান, আবার কতকগুলো মিশ্র। এইরকম সৃষ্টির সব জায়গায় আছে—যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষ সত্ত্বগুণপ্রধান বলা হয়েছে, বটবৃক্ষ, নিমবৃক্ষ সত্ত্বগুণপ্রধান। আমাদের

শাস্ত্রে সব জায়গার মধ্যেই এমন কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভাগও বলা হয়েছে সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যেটা caste system সেটা নয়। মানুষের মধ্যে হয়ে গেলেই তথাকথিত caste রূপে পরিণত হয় অথচ এটা caste নয়, এটা হ'চ্ছে গুণপ্রধান। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—ওখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারেই চতুর্বর্ণের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং যেখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য সেখানেই ব্রাহ্মণ হয়েছে, যেখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে অথচ রজোগুণের সঙ্গেও একটু যোগ আছে সেখানে হ'ল ক্ষত্রিয়—ক্রিয়াকলাপগুলি থেকে সেগুলি হয়। আবার তমোগুণ তা'র সঙ্গে একটু যোগ দিয়েছে—সত্ত্ব অল্প আছে, রজো আছে বেশী পরিমাণ, তারপর আছে বাকীটুকু তমঃ এটাই হল বৈশ্য। তারপরে তমোগুণের প্রাধান্য হয়েছে এবং সত্ত্বগুণকে ঢেকে দিয়েছে এবং সত্ত্বগুণ প্রকাশ হ'তে পারছে না, সেটা হ'ল শূদ্র। পশুপক্ষীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আছে। পশুর মধ্যে সিংহকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, কেননা তা'র মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে। সে হিংসা করে সেজন্য নয়, তা'র মধ্যে বিশেষত্ব আছে। এজন্য সিংহ হ'চ্ছে পশুপতি এবং ভগবতীর বাহন। দেবতাদের মধ্যেও এইরকম আছে। ইন্দ্রাদি দেবতা যত সমস্ত হ'চ্ছে ক্ষত্রিয়, আবার ব্রহ্মা, বৃহস্পতি প্রভৃতি এরা হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ, আবার বিশ্বদেব, গণদেব, বিশ্বে দেবা যাদের বলা হয় তাঁরা হ'চ্ছে বৈশ্য ইত্যাদি ইত্যাদি আছে দেবতাদের মধ্যে, অথচ তা'রা সকলেই অযোনিজ—এ হ'ল গুণের তারতম্য-বশতঃ। যেখানে গুণাতীত সেখানে কোন প্রশ্নই নাই।

যাই হোক্, সহজভাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে যে স্থান সত্ত্বগুণপ্রধান এটা সত্য, তেমনি সাধারণভাবে কোনো নিমিত্তবশতঃ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হ'য়ে গেছে। যে সমস্ত স্থানে ঋষিরা তপস্যা করেছেন—তপস্যা করলে সেই বিশেষ তপস্যার তেজ যেটা, সেটা সেইস্থানে pervade ক'রে থাকে দীর্ঘকাল। যিনি যত উচ্চস্তরের শক্তি আহরণ করেন সেখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই শক্তি থাকে। বুদ্ধদেব যে জায়গায় তপস্যা করেছিলেন বা যেখানে উপদেশ দিয়েছিলেন—যেখানে জ্ঞানসঞ্চার বা দীক্ষা প্রভৃতি দিয়েছিলেন সে স্থান-গুলো এখনও পবিত্র হয়ে আছে। এখনও একটুখানি শক্তি অনুভব করবার ক্ষমতা যাদের আছে সেই স্থানে বসলেই ভিতরে সেটা পাওয়া যায়। বুদ্ধ-গয়ায় যে কত বিশেষ শক্তি আছে, যারা সেখানে গিয়ে একটু ধ্যান করেছে তারাই বুঝতে পারে। স্থানের প্রভাব, সেই স্থানের স্বাভাবিক প্রভাব নয়, সেই স্থানে কোনো মহাপুরুষ তপস্যা ক'রে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

সুতরাং তাঁর দেহ চলে গেছে, জায়গা চলে গেছে, মাটি চলে গেছে, সেই স্থানটা রয়ে গেছে, সেই atmosphere রয়েছে। সেই atmosphereএর ভিতরে সূক্ষ্ম layerএ বা স্তরে সেই শক্তিগুলো ক্রিয়া করছে। সুতরাং যদি কেউ উন্মুখভাব নিয়ে সেখানে গিয়ে বসে অর্থাৎ open ভাব যে জিনিষটা—তা'হলে তার ক্রিয়া হবে, তা'র স্পন্দন পাবে। সব জায়গাতেই এরকম আছে।

তেমনিতর যেখানে কোনো দেবতার লীলা হয়েছে, কোনো দেবতা নর-রূপেতে এসে যেখানে খেলা করে গেছেন, তখন সেই দিব্যশক্তির প্রভাবটা atmosphereএর মধ্যে রয়ে গেছে। এর ভিতরে অতি সূক্ষ্ম স্তর আছে, যেটা না হ'লে এই আকাশ এবং বায়ুমণ্ডলের ভিতরে সেই সূক্ষ্ম স্তর অনুসারে এই atmosphereএর তারতম্য হ'ত না। এটা হ'চ্ছে পরিবেশ বা বাতাবরণ—অতি সূক্ষ্ম, যতক্ষণ মহাপ্রলয় না হয় সে জিনিষটা একেবারে যায় না। বাহিরের আবরণ নষ্ট হ'য়ে যাক্ না কেন, সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে সে জিনিষটা থাকে। সেটাও যদি সরে যায়, তা'র চেয়ে ভিতরে যেটা সেটা থাকবে। থাকবে না যখন, তখন সৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে যাবে, মহাপ্রলয় হ'বে। তা' না হওয়া পর্যন্ত চিরকাল থাকবে সে-জিনিষটা।

যাদের দৃষ্টি খুলে গেছে তা'রা সে স্থানগুলো দেখলে বুঝতে পারে। যেমনতর অনেক জায়গা আছে যা'কে বলে দগ্ধ, কোনো অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। এগুলো হয় তেজের বশতঃ। তেমনিতর উগ্র তেজে যেখানে সাধনা করা যায় সেই atmosphereটা ঊষরের মত হয় অর্থাৎ এমন জায়গা আছে যেখানে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কর্মবীজ অংকুরিত হয়, আবার এমন জায়গা থাকতে পারে যে জায়গাটা ঊষরের মত। এই মা-ই আমাদের যখন হরিদ্বার গিয়েছিলেন, ১৯২৯ বোধ হয়, তখন আমি ভোলাগিরির ধর্মশালায় ছিলাম, মা-ও সেখানে ছিলেন। মায়ের সঙ্গে বিকালে বেড়াতে যাই, একটা জায়গায় কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে বায়ুমণ্ডলের ভিতরে, সূক্ষ্মের ভিতরে দেখা যায় যে তপস্যা এবং জ্ঞানের ফলে সে জায়গাগুলো দগ্ধ, সেখানে কর্মের বীজ ওঠে না। এজন্য সে জায়গাগুলিকে জ্ঞানভূমি বলা হয়। লোকে সাধারণতঃ দেখতে পায় না।

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন আবিষ্কার করেছিলেন তখন, লোকনাথ গোস্বামী এবং অন্যান্য রূপ গোস্বামী প্রভৃতির দ্বারা এবং শুধু আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু নয়, বল্লভাচার্য, তিনিও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা, তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সেই লীলাস্থলগুলি আবিষ্কার করিয়েছিলেন। কোথায় কোন্ লীলা হয়েছিল তা'র indicationগুলো সেখানে এখনও আছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা

পাঁচশো বছরের কথা নয়, পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা—এখনও যাঁরা দেখতে পারেন তাঁরা দেখতে পান। সেই সব লীলাস্থান সব দেখতে পাওয়া যায়। 'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।' যা'র চোখ নেই, সে দেখতে পায় না। আমার যদি সে চোখ খোলে আমি দেখতে পাব।

ভাল লোক, খারাপ লোক সব জায়গায় আছে। এ দিয়ে তীর্থস্থানের মহিমা বোঝা যায় না। কোন সময়ে যদি সাধুরা তপস্যা ক'রে থাকেন, দেবগণের যদি আবির্ভাব হ'য়ে থাকে, ভগবানের লীলা যদি সেখানে প্রকাশ হ'য়ে থাকে, কোনো ভাল উপাসক যদি সেখানে উপাসনা করে থাকেন, তা'র একটা প্রকাশ সেখানে পাওয়া যাবে। যে-জাতীয় ক্রিয়া হ'বে সেই জাতীয় প্রভাব সেখানে থাকবে। স্বাভাবিকভাবে কতকগুলো থাকে, আর কতকগুলো নৈমিত্তিকভাবে থাকে। নৈমিত্তিক হ'ল বিশেষ নিমিত্তবশতঃ, যেমন কেউ তপস্যা করেছে—একটা দৃষ্টান্ত দিলাম—কেউ হয়তো নিষ্কাম উপাসনা করেছে সেখানে, আবার কোন দেবতা এসেছেন, উপর থেকে নিত্যসিদ্ধ মানুষ এসে কিছুদিন রয়েছেন বা অন্য কোনো লীলা হয়েছে, সেইসব জিনিষগুলোর ছাপ থেকে যায় সেখানে। সূক্ষ্ম ছাপ থেকে যায়। Psychometry ব'লে একটা বিজ্ঞান আছে, সেই psychometryর দ্বারা অনেক কিছু জিনিষ জানা যায়। একটি পাথর ধরে, Egyptএর একটা পাথর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে দশ হাজার বছর পূর্বে কে কি করেছিল, পাথরখানা কোথা থেকে এসেছিল, তেমনি একখানা চিঠি দেখে সেই মানুষের প্রকৃতি কি রকম, তা'র নাম কি, তা'র ধাম কি প্রভৃতি বের করা যায়।

কথা হ'চ্ছে, অতি সূক্ষ্মভাবে সংস্কারটা থেকে যায়। সূক্ষ্ম সংস্কার যেগুলো—বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক সংস্কার যেগুলো—সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে জিনিষের পরিবর্তন হ'য়ে গেলেও সে-জিনিষ নষ্ট হয় না, সে-জিনিষটা থেকে যায়। ভিন্ন ভিন্ন কারণে যেটা হয় সেটা হ'চ্ছে নৈমিত্তিক। আর একটা কথা হ'চ্ছে, স্বাভাবিক যেখানে বললাম, সেখানে একটা বুঝবার জিনিষ আছে। যেমনতর ভগবানের অবতার হয় বা কোনো মহাপুরুষের অবতার হয় বা কোনো বিশিষ্ট শক্তির অবতার হয় এই পার্থিব জগতে এবং সেটা জগতের বিশিষ্ট কাজের জন্যই হয়, তেমনিতর ভগবানের ধাম বা মহাপুরুষদের লীলাক্ষেত্র—যা নাকি উর্ধ্বস্তরে আছে, তা'দেরও কিন্তু অবতার হয়। শুধু যে ভগবানের অবতার হয় তা' নয়, ভগবানের যে শঙ্খ, চক্র তা'রও অবতার হয়, ভগবানের যে ফুল, ফুলের মালা তারও অবতরণ

হয়। অবতরণ হওয়া মানে প্রকাশে আবার সেগুলো আসে। তেমনি ধামেরও অবতরণ হয়। আমরা যে বৃন্দাবন বলি, কাশী বলি সব জায়গাতেই সেটা তাই। কাশী হ'চ্ছে কালের ঊর্ধ্বে, কাশী হ'চ্ছে দেশের ঊর্ধ্বে—কাশী হ'চ্ছে এই spaceএর মধ্যে নয়—'কাশতে তত্ত্বং' মাত্র, যেখানে নিরন্তর তত্ত্বের প্রকাশ হ'চ্ছে, সেইটার নাম হ'চ্ছে কাশী। কাশীতে দেহাভিমান থাকে না—যা'দের দেহাভিমান আছে তা'দেরও সেইস্থানে গিয়ে যদি মৃত্যু হয়ে যায় তা'হলে সেখানে সেই তত্ত্বের আকর্ষণে সেই পরম প্রকাশের মধ্যে চলে যায়। কাশী-মৃত্যুর কথা সাধারণ লোকে তো বোঝে না। মানুষ অনেক পাপ করল অথচ সেখানে গিয়ে মরল বলেই তার মুক্তি হ'ল—এ একটা প্রশ্ন তাই মানুষের মনে ওঠে। যেটা প্রকৃত কাশী হ'বে সেই কাশীর একটা মহিমা আছে, সে স্থানের একটা মহিমা আছে, তেমনিতর ভাবজগতের ভিতরে এমন সব স্থান আছে যে স্থানে একবার যদি আমি বাহ্যভাব থেকে মুক্ত হই—বহির্মুখ ভাবটা ত্যাগ ক'রে যে জিনিষটা সম্ভবপর হয়—হ'য়ে যদি একবার অন্তর্মুখ হই সঙ্গে সঙ্গে ভাবরাশিটা উন্মুখ হয়ে তাকে এসে ধরবে, অর্থাৎ সেই ভাবে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তাই স্থানের একটা প্রভাব আলাদা। যার মন অন্তর্মুখ নয়, sensitive নয়, সে সেটা অনুভব করতে পারে না।

যখন সৃষ্টি হয় তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে স্তরগুলো নেমে আসে। এ বিষয়ের আলোচনা স্বচ্ছন্দ আগমে আছে এবং অভিনব গুপ্ত ভাল করে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা যেটাকে মথুরা বলি মথুরাটা কোথায়—আমরা যেটাকে কাশী বলি সেই কাশী কোথায়—আমরা যেটাকে কন্‌খল বলি সেই কনখলটি কোথায়—আমরা যেটাকে ভুবনেশ্বর বলি সেই ভুবনেশ্বরটা কোথায়—আমরা যেটাকে গোকর্ণ বলি সেই গোকর্ণটা কোথায়—আমরা যেটাকে অবন্তী বলি সেই অবন্তীটা কোথায়? বিশিষ্ট জায়গাতে আছে সেটা সবাই জানে, সেটা প্রশ্ন নয় কিন্তু এটা তার নিজ স্থান নয়, এগুলো ঊর্ধ্ব থেকে এসেছে। ছাপ্পান্ন ভুবন রয়েছে তো উপরে। সেইখান থেকে হয়তো এসে পড়েছে—কোনটা হয়তো তেজস্তত্ত্বের ভুবন, কোনটা হয়তো বায়ুতত্ত্বের ভুবন, কোনটা হয়তো আকাশ তত্ত্বের ভুবন—নানারকমের আছে সব। এক একটা তত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে অনেক ভুবন আছে, অনেক planes আছে সব, তার মধ্যে কোনো কোনো plane এই জগতে এসেছে এবং ভগবানের সৃষ্টির মহিমাই হচ্ছে যে কোনো সময়ে মানুষের মন যখন অন্তর্মুখ হয় এবং তাঁকে পাওয়ার ও চিত্ত-শুদ্ধির চেষ্টা করবে তখন এইসব স্থান থেকে সাহায্য পাবে। যাদের চিত্ত অন্তর্মুখ নয় তাদের ক্ষেত্রে সব জায়গা যা, এ জায়গাও তাই। কিন্তু যাদের

মধ্যে অন্তর্মুখ ভাব আছে তা'রা এর থেকে সাহায্য পাবে। এইজন্য ঊর্ধ্বলোকের যে তেজ তা অধোলোকেও সঞ্চার করে দিয়েছেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল এগুলো যখন সৃষ্টি হ'য়েছে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ জিনিষ তা'রা পেয়েছে এবং শুদ্ধ যে তা'র প্রত্যেকের সঙ্গে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। একটা ভগবৎ তত্ত্ব জগতে যখন আসে তখন নানারূপে তা প্রকাশ পায় কিন্তু প্রত্যেক লোকের সঙ্গেই প্রত্যেক লোকের একটা পার্থক্য থাকে, একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। ধরুন, কাশীটাও শুদ্ধতত্ত্ব, সেই জায়গা থেকে এসেছে, যেমন মথুরাতত্ত্ব গোকুলতত্ত্বের ভিতরে। বৃন্দাবন নামটা নতুন নাম আমাদের, খুব বেশী পুরানো নয়, গোলোক তত্ত্বের ভিতরে গোকুলতত্ত্ব, তার ভিতরে মাথুর মণ্ডল, মাথুর মণ্ডলের ভিতরে শ্বেতদ্বীপ সেই শ্বেতদ্বীপের ভিতর থেকে এসেছে। সাকেত, যা'কে আমরা অযোধ্যা বলি, এখন তা'রও একটা স্থান আলাদা আছে। সব জিনিষগুলোরই নিত্য ধামে একটা স্থান আছে, প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে স্থান আছে। এ সবই গুণময় বৈচিত্র্য, রজোগুণ ও তমোগুণ নেই কিন্তু সত্ত্বগুণ তো রয়েছে।

সত্ত্বগুণের থেকে অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ রয়েছে,—সেখানে ফুল আছে, ফল আছে, নদী আছে, পাহাড় আছে, পর্বত আছে—সবই আছে, সেখানে নেই কি ক'রে বলব? তবে এখানকার মত নয়—এটা পরিণামশীল, রজোগুণ তমোগুণ মিশ্রিত, এবং কালের অধীন। কিন্তু সেটা কালের অধীন নয় এবং রজোগুণ তমোগুণের দ্বারা মিশ্রিত নয় বলে বিশুদ্ধ। সেই সব জিনিষগুলো রয়েছে কিন্তু বৈচিত্র্য আছে। গোলাপও সুন্দর, কমলও সুন্দর কিন্তু গোলাপের একরকম সৌন্দর্য্য আর কমলের অন্যরকম সৌন্দর্য। এ বৈচিত্র্য না থাকলে জগতে আনন্দ হয় কি? সব রকমের বৈচিত্র্য আছে। আমাদের পার্থিব জগতে সেই বৈচিত্র্যটা যাতে খোলে সেইজন্য সৃষ্টির সময়েই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান স্থানগুলি জগতে দিয়েছেন। যেমন বললাম বৃক্ষ, লতাপাতা তা'র মধ্যেও যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক আছে তেমনি এ-ও তাই। গরুকে যেমন আমরা ভগবতী বলে মনে করি কিন্তু যা'রা বোঝে না তা'রা গরুকে শুধু একটা ordinary পশু বলে মনে করে। কিন্তু আমরা তো জানি তা'র কত মহিমা—বৈদিক যুগের থেকেই সেটা আমরা জানি। তেমনি প্রত্যেক পশুরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তবে গরুর মত না হোক্ প্রত্যেকেরই একটা আদর্শ বৈশিষ্ট্য আছে।

স্থানেরও তেমনি বৈশিষ্ট্য আছে, তবে কোনো স্থানে স্বাভাবিক সিদ্ধ ভাবের বিকাশ হ'তে পারে, কোনো স্থানে প্রেমের বিকাশ হ'তে পারে, কোনো

স্থানে জ্ঞানের বিকাশ হতে পারে, কোন স্থানে যোগসিদ্ধির বিকাশ হ'তে পারে। ধরুন, ত্রিকোণ আছে—যা'কে আমরা বিন্ধ্যাচল বলি সেটা ত্রিকোণ স্থান, কামরূপ কামাখ্যাও ত্রিকোণ স্থান, অথচ ক্যামরূপ কামাখ্যায় যে ক্রিয়াটা হবে বিন্ধ্যাচলে সে ক্রিয়া হয় না। আর বিন্ধ্যাচলে যে ক্রিয়াটা হয় সেটা কামরূপ কামাখ্যায় হয় না। মন্ত্রের পুরশ্চরণ বা জাগাতে হ'লে বিন্ধ্যাচলে যে কাজ হ'বে বা কামরূপ কামাখ্যায় যে কাজ হ'বে অন্য জায়গায় তা' হয় না। এইজন্য প্রসিদ্ধ কামরূপ পীঠ হ'চ্ছে ওটা, এজন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিন্ধ্যাচলে প্রপঞ্চের থেকে বাইরে যেতে হ'লে, সরে যেতে হ'লে ঐখানে দরজাটি আছে। বিন্ধ্যাচলের মধ্যবিন্দু যেটা বিন্দুবাসিনী, সেই যে বিন্দুটা সেই বিন্দু থেকে ত্রিকোণের মধ্যে চলে যাওয়া যায়। এটা কামরূপ কামাখ্যাতে নেই কিন্তু সাধারণ লোকে তা বুঝতে পারে না। স্থানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাচীন মুনি ঋষি এবং ভগবান যত রূপে প্রকাশ হয়েছেন জ্ঞান দেবার জন্য, সকলেই এটা পরিস্ফুটভাবে ব'লে গেছেন। এটা তর্ক ক'রে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। তবে অনুভব করবার জিনিষ, অনুভব না করলে সেটা বুঝতে পারা যায় না।

তা'হলে একটা হল স্বাভাবিক বৈচিত্র্য যা স্থানের মধ্যে আছে, তেমনি নৈমিত্তিক কোন বিশেষ কারণে বৈচিত্র্য উঠেছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য বরাবর চলে যাচ্ছে যতক্ষণ মহাপ্রলয় না হ'চ্ছে। এই দুই কারণেই স্থানের বৈশিষ্ট্য হয় এবং বৈশিষ্ট্য দ্বারা সাধক যা'রা তা'রা উপকৃত হয়।

তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে পৌরাণিকরা বলে গেছেন, যখন নাকি যজ্ঞ হ'ত বেশী—যজ্ঞ হ'ত, অগ্নিহোত্র ছিল, নিরন্তর বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ হ'ত তখন তীর্থযাত্রাটা তত বেশী প্রচলিত ছিল না। তারপরে যজ্ঞটা ক্রমশঃ যখন উঠে গেল—বিশেষ ক'রে কলিযুগের প্রারম্ভে, দ্বাপর পর্যন্ত যজ্ঞের প্রচলন ছিল—কলিযুগে rare occasionএ যজ্ঞ হ'ত, বিশেষ হয়নি—তাই জীবের উদ্ধারের জন্য সর্বদাই তো তাঁদের মন কাতর ছিল—এটা করতে পারছে না, কোনো একটা রাস্তা তা'দের দিতেই হ'বে তো। তীর্থযাত্রা যদি মানুষ ঠিকভাবে করতে পারে তা'হলে যজ্ঞ করার যে ফল তা পায়। তাই তীর্থের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি তত্ত্বের দিক্ দিয়ে যাচ্ছি। লৌকিক ভাবের কথা পরে বলব। কি ক'রে তীর্থযাত্রা করতে হয়—কি ক'রে যেতে হয়, মনটা কি রকম রাখতে হয়—এটা তো সাধারণ কথা, সাধারণ লোক এ কথা ভাল জানে। আসল জিনিষটা কি তাই বলছি।

তীর্থ যে করতে হ'বে তা'র একটা বিজ্ঞান আছে। সবটা নিয়ে নররূপেতে

কল্পনা করতে হয়। যেমন ন্যাস করে—মানুষ জানে যে ভাবেই ন্যাস করুক্ না কেন—তান্ত্রিক অথবা পৌরাণিক—তা'র উদ্দেশ্য কি? কোনো দেবতা বা কোনো স্থান। স্থানেরও ন্যাস আছে তো, দেবতাদেরও ন্যাস আছে, শক্তিরও ন্যাস আছে। ন্যাস মানে হ'চ্ছে Super-imposition অর্থাৎ দেহের কোনো একটা অংশেতে শক্তিকে স্থাপনা করা বা কোনো একটা দেবতাকে স্থাপনা করা বা কোনো একটা তত্ত্বকে স্থাপনা করা। স্থাপনা করা মানে মনে মনে একটা ভাবনা করা যে এখানে এই জিনিষটা আছে। ভাবনা শক্তির দ্বারা, through the power of imagination, এইটা ধারণা করবার চেষ্টা করা যে এগুলো আছে।

ঠিক সেইরকম ভাবে আমাদের দেহে যদি একটা দেবতার ন্যাস করা হয়, তা'হলে দেখা যাবে পায়ের বুড়ো আঙুলের থেকে নিয়ে মাথার কেশের অগ্রভাগ পর্যন্ত সব জায়গাগুলোতে দেবতা আছেন। মাতৃকার ন্যাস যখন করব, তখন দেখা যাবে পায়ের বুড়ো আঙুলের থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত সমস্ত বর্ণমালা দিয়ে সাজানো অর্থাৎ বর্ণমালাগুলোই একটা human form নিয়েছে, মানুষের মূর্তি তৈয়ারী হয়েছে বর্ণমালা দিয়ে। তেমনি মানুষের মূর্তি তৈয়ারী হয়েছে এই সমস্ত তত্ত্ব দিয়ে, এই সমস্ত ভাব দিয়ে। অর্থাৎ আমি যেন সেই দেবতার দ্বারা তৈয়ারী, আমি যেন সেই তীর্থগণের দ্বারা নির্মিত—এইরকম ভাবটা। যা'রা বিজ্ঞান অনুসারে তীর্থ করে যেখানে যে তীর্থ অর্থাৎ গুরুপরম্পরার ধারা প্রচলিত, তা'দের সেইভাবে আরম্ভ করতে হয়।

তীর্থের মধ্যে একটা হ'চ্ছে কর্মক্ষেত্র আর একটা হ'চ্ছে জ্ঞানক্ষেত্র, আর মাঝখানেতে ভাবক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রকে প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্র নাম দিয়ে তাঁরা বলতেন। 'অন্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং কুরুক্ষেত্রে বিনশ্যতি, কুরুক্ষেত্রে কৃতং পাপং বারাণস্যাং বিনশ্যতি, বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রাসনং ভবিষ্যতি'—এ কথা তাঁরা বলে গেছেন। যদি কেউ কাশী গিয়ে পাপ করে তা'হলে কি হবে? না, 'বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রাসনং ভবিষ্যতি', কেননা জ্ঞানের পর কিছু নেই, কেননা জ্ঞানকৃত যে পাপ তা'র আর ক্ষয় হয় না। কখন এ পাপের ক্ষয় হ'বে তা হলে? কাশীমৃত্যু হলে, তা'র একটা অনুশোচনা হবে, একটা ভোগ হ'বে, পাপের দণ্ডটা সে পাবে কিন্তু স্থানের মহিমাবশতঃ যেখানে দীর্ঘ-কালে হওয়ার কথা সেখানে কম সময়ে হ'বে। তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয়, অজ্ঞানকৃত পাপ তীর্থযাত্রা দ্বারা নষ্ট হয়। সেইজন্য গৃহস্থদের একটা বিধান দেওয়া হয়েছিল, সকলেই যেন তীর্থযাত্রা করে। দ্বিতীয়তঃ

হচ্ছে, তীর্থক্ষেত্রে গিয়েও তো পাপ হয়, তার উত্তরে বলা হল, কাশীতে গিয়ে সেটা নষ্ট করে, এইজন্য সেইরকম বিধান দেওয়া হয়েছিল।

তীর্থে গিয়ে তীর্থ যা'তে ঠিকভাবে করতে পারে, ঠিক সাত্ত্বিক ভাবে, ঠিক সদাচারপরায়ণ হ'য়ে, মনে সদ্‌ভাব রেখে তীর্থের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর দিকে একলক্ষ্য হ'য়ে যদি কেউ তীর্থ করতে পারে, তা'হলে তীর্থ তা'র দিকে প্রসন্ন হন এবং তা'কে নিজের যা কিছু দেবার তা দেন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করেন। যে তীর্থের যতটুকু সামর্থ্য আছে সে সেটা করে। মানুষ তীর্থ করে কিসের জন্য? পাপ তাপ ক্ষালনের জন্য। তীর্থস্থান পবিত্র, স্বভাবসিদ্ধভাবে পবিত্র এবং সেই পবিত্র ভাবটা স্মরণে রেখে যদি সেই স্থানে সে যায় এবং সেইখানে তা'র যা কিছু কৃত্য সেইটা যদি সে করে তা হ'লে পাপের থেকে সে মুক্ত হ'তে পারে—এরকম কথা তাঁরা বলে গেছেন। তেমনিতর কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো পাপ আচরণ হয় সেটা অজ্ঞানে হয়ে গেল। কেননা জ্ঞান না আসা পর্যন্ত অজ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞানের পূর্বে তো কর্ম রয়েছে, শুদ্ধ কর্ম রয়েছে। এইজন্য সেই ক্ষেত্রের নাম হচ্ছে কুরুক্ষেত্র।

তা হলে তীর্থযাত্রার যে একটা সার্থকতা আছে আমাদের আচার্যগণ প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবস্থা দ্বারা সেগুলো ঠিক করে দিয়ে গেছেন। আর একটা কথা হ'চ্ছে এই যে, তীর্থগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানেতে আছে—যেমন কাশী কোথায়? ভ্রূমধ্যের উপরে। আবার নাভির নীচে আছেন কামাখ্যা, আবার হৃদয়ের বাঁদিকে আছেন সাকেত, অযোধ্যা। আবার সহস্রদল কমলের মাঝ-খানটায় আছেন বৃন্দাবন, গোকুল—'সহস্রপত্রং গোকুলং'—এমনিভাবে বিভিন্ন সব তীর্থগুলো রয়েছে। এগুলো অন্তঃতীর্থ অর্থাৎ দেহের মধ্যেই তীর্থ। তা হলে বুঝা গেল, সমস্ত দেহটাই আমার তীর্থময়, মনুষ্যদেহেতে এমন কোনো জায়গা নাই যেটা তীর্থশূন্য, সব জায়গায় তীর্থ আছে। সুতরাং জ্ঞানপথে যারা নাকি চলে তা'রাও তীর্থ করে। যেমন বাইরের স্নান যারা করে তারা করে কিন্তু যারা উচ্চাধিকারী তাদের বাইরে স্নান দরকার নেই এবং ক্ষতিকর এমন একটা অবস্থা আছে তো, যেমন জল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু স্নান বন্ধ হয় না। এই যে বাইরের জল দিয়ে স্নান করা বা গঙ্গাস্নান করা সেটা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ভিতরে স্নান করা যায়। মন্ত্রস্নান আছে, সেটাও তো স্নান বা মাটি দিয়ে স্নান হয়, সেটাও স্নান বা বায়ু দিয়ে স্নান হয় সেটাও স্নান, ভস্ম দিয়ে স্নান হয় সেটাও স্নান—শৈব অবধূত তা'রা এইভাবে স্নান করে তা'রা ভস্ম লাগায়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্নান হল কোনটা? যখন নাকি সহস্রার থেকে সেই যে মধ্যবিন্দু, সেই বিন্দুক্ষরণ যখন হয়, মানে সেই চিদ্-

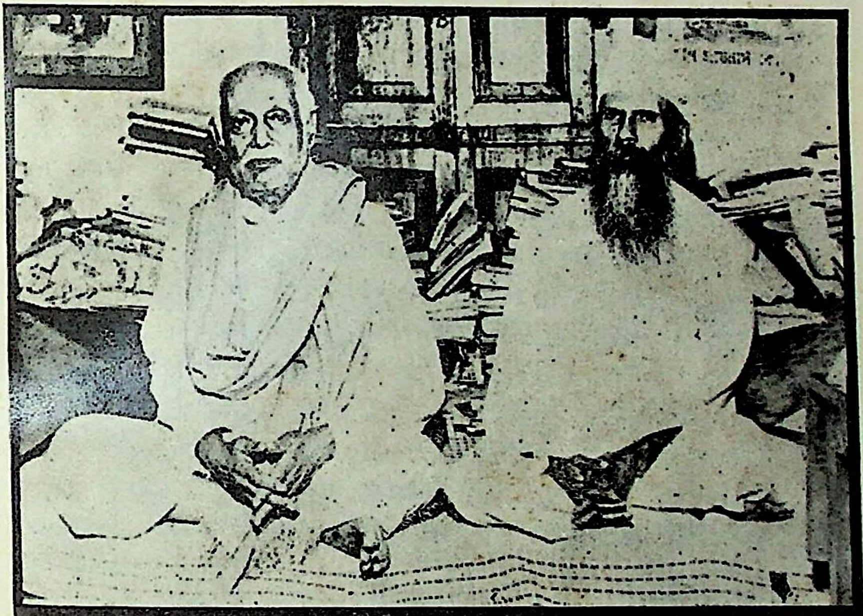
ভূমি, যেটা নাকি কুলকুণ্ডলিনীর অধীনে, যখন নাকি সুষুম্নার মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে যায়, গিয়ে সেই সহস্রারে চন্দ্রবিন্দুকে স্পর্শ করে তখন সেটা গলে যায়, গলে সেখান থেকে স্রাব হয়, নীচে নামে, নামতে নামতে নিজের দেহের যতগুলো তত্ত্ব আছে, যতগুলো কোষ আছে, যত মাতৃকা আছে, যত পরমাণু আছে, যত উপাদান আছে সমস্ত তা'র দ্বারা শোধিত হয়ে যায় এবং সমস্ত দেহটা ক্ষালিত হয়ে যায় এবং বাইরে দেখতে পায় স্নান করে এলাম অথচ জল স্পর্শই করিনি। সমস্ত নির্মল হয়ে যায়—ভিতরটা হয়ে যায়, বাহিরটাও নির্মল হয়ে যায়। মুখ্যস্নান তো সেইটাই, মুক্তিস্নান যেটাকে বলে, যথার্থ কুণ্ড তো সেইটাই—এও ঠিক সেইরকমের। প্রকৃত তীর্থ যদি করতে হয় দেহের মধ্যেও করা যায়, তা'র জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না এবং ভ্রূমধ্যের ঊর্ধ্বে যদি ওঠা যায় তা'হলে তো সেখানে কাশীগতি হ'য়ে গেল এবং সেখানে যদি অহংবুদ্ধি দেহাভিমান ত্যাগ হ'য়ে যায় তার নামই হচ্ছে কাশীমৃত্যু—নূতন কিছু তো নয়। তবে সাধারণের জন্য রেখেছেন যাদের নাকি যোগের দ্বারা প্রবেশের অধিকার নাই, তারাও সেই advantageটা পেতে পারে আর জ্ঞানের দ্বারা যে যেখানেই থাক না কেন সেখানেই তার কাশীমৃত্যু হ'বে। গীতাতে পরিষ্কার বলেছেন ঃ 'প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব, ভ্রুবোর্মধ্যে প্র্যাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।'

তবে সাধারণের পক্ষে একটা স্থানবিশেষ আছে এবং সেই স্থানের তেজকে অবলম্বন ক'রে যদি তা'র মৃত্যু হয় তবে তা'র কাশীমৃত্যু। আর অসাধারণের পক্ষে অর্থাৎ জ্ঞানী বা ভক্ত, তা'র কাশীমৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। স্থানের একটা মহিমা আছে, সেটা সত্য—ভিতরেও আছে, বাইরেও আছে। বাইরে আছে সর্বসাধারণের জন্য, আর অত্যন্ত অনধিকারী অথচ ভগবানের কৃপার অধীন হ'য়ে রয়েছে, তাঁর শরণাগত হয়ে রয়েছে, তা'র জন্যও ব্যবস্থা আছে। এ ভিতরের দিকের। এ দেহটাও তীর্থময়। আমরা ভারতবর্ষ যেটাকে বলি সেটাও সমস্ত তীর্থের দ্বারা বেষ্টিত—পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব—কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্তগুলো তীর্থ। সেইজন্য প্রাচীন আচার্যগণ নিয়ম ক'রে দিয়েছিলেন কন্যাকুমারিকা থেকে আরম্ভ ক'রে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, সব তীর্থগুলিকে ধরে রাখবার জন্য, যাতে নাকি একটা শুদ্ধ তেজকে সংরক্ষণ করা যায় এবং সেটাকে চালিত করা যায়, circulate করা যায়, তা'র জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই হ'ল তীর্থের মোটামুটি কথা।

একটা সাধারণ নিয়ম আছে কোন্ তীর্থের পর কোন্ তীর্থে যেতে হয়। তাঁরা বলেন, আরম্ভ করতে হয় কামাখ্যা থেকে—এক একটা ধারা অনুসারে

আমি সামান্যভাবে বলছি। যেমন দেহেতে সাজানো আছে তেমনি বাইরেও ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে অনুগত হ'তে পারে। পর পর তীর্থগুলো করতে হয় —কামাখ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে মায়াপুর, তারপর ছেড়ে হিমালয়ের উপর কৈলাস পর্যন্ত অর্থাৎ সহস্রদল কমলের বিন্দু যেটা। তা' হ'লে সহস্রদল পর্যন্ত যাবে সেটা—এটা বাইরের সহস্রার—এ রকম ব্যবস্থা আছে। এটা অতি দুরূহ এবং বিশেষ গুরুজনের আদেশ এবং নির্দেশ ভিন্ন এটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, সকলে জানেও না। তা না হ'লে সব জায়গাতেই সব আছে। প্রত্যেক তীর্থের মধ্যেই অন্য সব তীর্থের সম্ভাবনা আছে। যেমন আমরা বলি, কাশীর মধ্যে সব দেবতা আছে, সব তীর্থ আছে—কাশীতে প্রয়াগঘাট আছে, কাশীতে কুরুক্ষেত্র রয়েছে দুর্গাবাড়ীর কাছে, কাশীতে কামাখ্যা আছে, কাশীতে সিগ্‌রা আছে শ্রীগিরি, শ্রীশৈল—সেজন্য বলা হয় কাশীর মধ্যেই সব আছে। শুধু কাশী বলে কেন, সব তীর্থের মধ্যেই সবকিছু আছে। কাশীতে অতি উজ্জ্বল পরিষ্কারভাবে সকলের ধরবার মত কিন্তু অন্য জায়গায় সেটা ধরতে পারে না। কিন্তু অনুসন্ধান করলে সব জায়গাতেই সব জিনিষ পেতে পারে। কাজেই যে কোনো তীর্থে গিয়ে অন্য কোনো তীর্থের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হ'লে সকলকেই অর্পণ করা হ'ল। এটা হ'ল একটা দিক্।

এখন কথা হ'চ্ছে এই যে তীর্থগমন, তীর্থযাত্রা করতে হয় কি ভাবে? নিয়ম ছিল প্রাচীনকালে—খুব সূক্ষ্মভাবে নিয়মটা বলি—প্রথম সংযম করতে হবে, তারপর সংযতভাবে একলক্ষ্য হ'য়ে যেতে হ'বে। আর নিয়ম হ'চ্ছে মিথ্যা কথা বলবে না, মিথ্যা চিন্তা করবে না, অন্য কোন চিন্তা করবে না, সংসারের চিন্তা করবে না—যে কোন তীর্থে যাওয়া হোক না কেন, সেই তীর্থেরই চিন্তা করবে, বাড়ীঘর ছেলেপিলে ফেলে যে চলে যাচ্ছ—প্রাচীনকালে তো হেঁটেই যেতে হ'ত—সব ভুলে গিয়ে করতে হবে, একমাত্র তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁকেই লক্ষ্য করে যেতে হ'বে। লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ততটুকুই করতে হ'বে যতটুকু দেহরক্ষার জন্য দরকার—বাকী সমস্ত প্রাণ মন সবটাই থাকবে ইষ্টের উপরে—ইষ্ট মানে তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যে তীর্থে যাচ্ছ তাঁতে। যাঁকে লক্ষ্য ক'রে আমি যাচ্ছি—ধর, আমি বদ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছি—যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো বদ্রীনারায়ণ গিয়ে পৌঁছালাম না। কিন্তু আমি যদি প্রকৃত তীর্থযাত্রী হই, তা হ'লে আমি যখন থেকে রওনা হ'য়েছি তখন থেকেই আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছেন বদ্রীনারায়ণ, তাঁকে লক্ষ্য ক'রেই আমি যাচ্ছি—আমি যদি শেষ পর্যন্ত উপনীত হ'তে না-ও পারি, তা' হ'লে যেখানেই আমার



বারাণসী সিগ্‌রা ভবনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ও শ্রীমৎ অনির্বাণ

দেহত্যাগ হোক না কেন সেখানেই আমার বদ্রীনারায়ণ দর্শন হ'বেই হ'বে। তাঁকে লক্ষ্য করে চলেছি আমি—আমি যে সেখানে যেতে পারলাম না that does not matter.

আমি একটা ঘটনা জানি : পারুল ব'লে একজন মহিলা ছিলেন (অনেক দিনের কথা—৩০।৪০ বৎসর পূর্বের কথা), তিনি কাশীতে ছিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল—দেব-দেবীর দর্শন হ'ত। তিনি দৈববাণী পেতেন এবং অনেক কিছু পেতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর এক পিসিমা ছিলেন, তিনি কাশীতে মরবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলেন কিন্তু অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁর ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কাশীতে আসতে পারেননি। তিনি একদিনের ঘটনা বললেন যে বাঙ্গালীটোলায় এক জায়গায় কাশীখণ্ড পাঠ হচ্ছিল, তিনি সেই পাঠে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন তাঁর পিসিমাকে—তাঁর আশ্চর্য মনে হ'ল—তিনি তো কাশীতে আসবার আকাংখা করেছিলেন, বোধহয় কোনো সুবিধা হয়ে গেছে আসবার। পাঠ শেষ হ'বার পর যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর যে পিসিমা বসেছিলেন তাঁকে কেউ লক্ষ্য করেনি অর্থাৎ অন্য লোকের ব্যবহার দেখে মনে হ'ল তাঁকে কেউ দেখেনি। তখন তিনি পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমি আপনাকে দেখছি এটা ভুল নয় তো ?' উত্তরে তাঁর পিসিমা বললেন : 'না, তুমি ভুল দেখছ না' এবং উত্তরে বললেন 'আমিই তোমার পিসিমা।' তিনি তখন পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি তাহ'লে কাশীতে এসেছেন ?' উত্তরে পিসিমা বললেন : 'আমি বিদেহ অবস্থায় আছি। মৃত্যুর সময়ে প্রাণটা ভয়ানক ব্যাকুল হয়েছিল বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য : হে বিশ্বনাথ! তোমার দর্শন পেলাম না! তখন দেখলাম সামনে বিশ্বনাথ এবং সমস্ত কাশী আমার সামনে।' পিসিমা আরও বললেন জিজ্ঞাসার উত্তরে : 'বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীমৃত্যু হ'য়েছে এবং বিশ্বনাথের কাশীতে স্থান পেয়েছি।'

এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল ? শিবের উপরে এত তীব্র ভক্তি ছিল, তাই শিব বাহ্যতঃ আকাংখা পূরণ না করলেও ভিতরেতে সে আকাংখা পূরণ ক'রে দিয়েছিলেন। এটা বলবার উদ্দেশ্য সব জায়গাতেই সব জিনিষ আছে কিন্তু পেতে হ'লে সে-ভাবনা চাই। সেই ভাবে না চাইলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। পাবে কে ? যে তাঁকে সেইভাবে ধরবে সে-ই পাবে, তাঁকে সেইভাবে না ধরলে তো পাওয়া যাবে না।

তীর্থযাত্রা করতে হ'লে একলক্ষ্য হ'য়ে করতে হ'বে। আমি যাব কামাখ্যা, কামাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই চিন্তা করতে হ'বে। যখন কাশীতে

আসব তখন বিশ্বনাথকে চিন্তা করতে হ'বে, কেননা তিনি কাশীর অধিষ্ঠাতা। যখন মথুরায় যাব তখন মথুরার অধিষ্ঠাতা বাসুদেবকে চিন্তা করতে হ'বে। বৃন্দাবনে যখন যাব তখন বৃন্দাবনের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে হ'বে—অর্থাৎ একটা ভাব থেকে আর একটা ভাবে যাচ্ছি। তীর্থে গিয়ে তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁকে প্রণাম করতে হয় এবং পরিক্রমা করতে হয়। তারপর তাঁর সঙ্গে অভেদ যখন হ'য়ে গেল, তখন আবার অন্য তীর্থে যেতে হয়। দেহ হ'চ্ছে সর্বভাবময়—সবগুলো ভাবকে শোধন করছি আমি। কাজেই যখন যেখানে যাব সেটাই হ'বে আমার লক্ষ্য। অর্থাৎ সব তীর্থে গিয়ে সেই সেই তীর্থের তেজটা নিতে হয়। সব তীর্থের যেগুলো আমার আন্তর দেহ রচনার জন্য আবশ্যক, সবগুলোকে যদি আপন ক'রে নিতে পারি, তা' হ'লে আমার দেহটা তীর্থময় হ'ল না কি? যে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া করতে পারে না, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে না সে যদি তীর্থের সেবা করতে পারে সাত্ত্বিকভাবে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে, তা হ'লেও তা'র অন্তর শুদ্ধি হ'য়ে যায়। এইজন্যই তীর্থের বিধান।

পরমপদ

মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য পরম পদ কিন্তু ইহার স্বরূপ যে কি সে বিষয়ে সর্বত্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে আছে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—ইহা হইতে জানা যায় দিব্য সূরিগণ বিষ্ণুর এই পরম পদকে নিরন্তর অনিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার স্বরূপ ঠিক একটি চক্ষুর আকার। দ্যুলোকে আতত ও ব্যাপ্ত চক্ষুর আকার যে প্রকার, ইহার আকারও ঠিক সেই প্রকার। 'সদা পশ্যন্তি' এই বাক্যাংশ হইতে বুঝা যায় যে, এই পদের দর্শন, নিমেষ-উন্মেষ যুক্ত দৃষ্টির দ্বারা হয় না। দৃষ্টির নিমেষ-উন্মেষ কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ইহার দর্শন সম্ভবপর নহে। প্রাণ ও মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন দৃষ্টির উন্মেষাদি ঘটিয়া থাকে। প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ শান্ত হইলে শুধু জ্ঞাননেত্র দ্বারা এই দর্শন সিদ্ধ হয়। জ্ঞাননেত্রই মানুষের তৃতীয় নেত্র। যতদিন তাহা উন্মীলিত না হয় ততদিন, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকিয়া, ইহা দর্শন করা যায় না। ইহাতে প্রবেশ করা যায় কিনা সে প্রশ্নের উত্তর এই বৈদিক মন্ত্রে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দেওয়া না হইলেও ইহার উত্তর কি কি হইতে পারে তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে।

দিব্য সূরিগণের সর্বদা দৃশ্যমানং এই পরমপদে প্রবিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে দুইটি মত বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রথম মতটি এই যে, ইহা শুধুই দর্শন করা যায়, ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। অর্থাৎ এখনও কেহ ইহাতে প্রবেশ করে নাই।

দ্বিতীয় মতটি এই যে, ইহাতে প্রবেশ করা যায় এবং কেহ কেহ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই পক্ষেও দুইটি অবান্তর স্থিতি বর্তমান আছে।

একমতে প্রারব্ধ কর্মের জন্য বর্তমান দেহের অন্তে, প্রবেশের যোগ্যতা থাকিলে, প্রবেশ করা সম্ভবপর। ইহার মধ্যেও দুইটি বিকল্প আছে। মরণ-কালে স্বাভাবিক ক্রমে দেহবোধ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ নিবৃত্ত হইলে প্রবেশ সম্ভবপর। অথবা দেহাবস্থায় থাকিলেও স্বেচ্ছায় দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিতে পারিলে যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ সম্ভবপর। দেহাবস্থায় প্রবেশ করিলে দেহপাত

অবশ্যম্ভাবী অথবা দেহাবস্থায় প্রবেশ করিলেও দেহসত্তা পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। যে-স্থিতিতে দেহপাত অবশ্যম্ভাবী সেই স্থিতিতে নির্গম ঘটে না। বলা বাহুল্য ইহা অপক্ক ও অসিদ্ধ দেহের কথা। অন্যস্থিতি অনুসারে প্রবেশ করিলেও দেহ থাকে বটে কিন্তু দেহবোধ থাকে না। এই স্থিতিতে নির্গম সম্ভবপর এবং নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে দেহবোধ ফিরিয়া আসে। বলা বাহুল্য ইহা পক্ক দেহের ব্যাপার।

এইখানে যাহা বলা হইল তাহার সার সঙ্কলন করিলে ইহাই বুঝা যায় যে পরমপদ সম্বন্ধে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন যে পরমপদে প্রবেশ করা যায় না, তাঁহাদের তাৎপর্য এই, আজ পর্যন্ত এইস্থানে কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বেদান্তের একজীববাদীগণের মধ্যে কাহারও কাহারো মতে একজীবের মুক্তি হইলেই সমগ্র বিশ্বের অর্থাৎ যাবতীয় জীবের মুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু সেই একজীবের মুক্তি এখনও পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। হইলে সকল জীবেরই মুক্তি সিদ্ধ হইয়া যাইত। শুকদেব, বামদেব প্রভৃতিও এই দৃষ্টিতে প্রকৃত মুক্তিলাভ করিয়াছেন কিনা কেহ কেহ সন্দেহ করেন। ইঁহারা বলেন যদি পরম পদে কেহ প্রবেশ করিত, এমনকি একজীববাদীদের একজীবও যদি তাহাতে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে জগতের স্বরূপ আর এ প্রকার থাকিত না। কালের জগৎ তখন আনন্দময় শ্রীভগবানের নিত্য লীলাভূমি রূপে সকলের নিকটই প্রতীত হইত। কিন্তু তাহাতো হইতেছে না। সুতরাং পরমপদে প্রবেশ এ পর্যন্ত একজনেরও হইয়াছে তাহা স্বীকার করা—যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। বাস্তবিকপক্ষে যদি একজন প্রকৃত সত্যের দ্রষ্টা জাগতিক ভূমিতে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা হইলে ঐ ভূমির সর্বত্রই তাহার প্রভাব পড়িত। কারণ আকাশে সূর্যের উদয় হইলে তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ তাহার নিজ শক্তির দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে সাধারণ মুনি ঋষি তো দূরের কথা, দিব্য সূরিগণও উক্ত পরমপদের দর্শন মাত্রই করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহাতে প্রবেশ করেন—একথা উক্ত মন্ত্রে নেই। সূরিগণ সকলেই অপ্রাকৃত দেহসম্পন্ন। তবে কাহারও কাহারও উক্ত দেহের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত দেহও আছে। যাঁহারা শুধু অপ্রাকৃত দেহ সম্বন্ধে সূরি তাঁহাদের নাম দিব্য সূরি। অন্যান্য সকলে শুধু সূরি পদবাচ্য।

বলা হইতেছে যে যাঁহারা পরমপদে প্রবেশ স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেহাবস্থাতে প্রবেশও স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে

যাঁহাদের প্রাকৃত দেহ পক্ব হয় নাই বা অপ্রাকৃতরূপে পরিণত হয় নাই অর্থাৎ মিশ্র অবস্থায় আছে তাঁহারা প্রবেশ করিলে তাঁহাদের প্রাকৃত দেহ নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা ফিরিয়া আসেন না এবং তাঁহাদের নির্গম হয় না। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহ ঐখানেই থাকিয়া যায়। অন্যপক্ষে যাহাদের দেহ পরিপক্ব হইয়াছে তাহারা পরমপদে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু তখন তাহাদের সিদ্ধ দেহ প্রণব-তনুতে পরিণত হয়। নির্গম হইলে পুনর্বার সিদ্ধ দেহ লাভ হয়। ইহারা অজর ও অমর; ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্ব-কল্যাণের জন্য সিদ্ধ দেহ লইয়া থাকে বলিয়া প্রণব-তনুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রণব-দেহ হইতে পুনর্বার সিদ্ধদেহে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। লোক-কল্যাণ নিমিত্ত শুদ্ধ বাসনা পূর্ণ হইয়া গেলে প্রণব-তনু হইতে সিদ্ধদেহে আর অবতরণ করে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে শ্রীভগবানের পরম ধামের বর্ণনা আছে, যেখানে গমন করিতে পারিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না, তাহা পূর্ববর্ণিত পরম-পদেরই নামান্তর বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে পরম-পদে যে যাওয়া যায় (যদ্‌গত্বা) তাহা গীতাসম্মত বলিয়া বুঝিতে হইবে। গীতাতে অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবৎস্বরূপভূত এই পরমপদে প্রবেশ করিতে হইলে সাধারণতঃ একটি ক্রম অবলম্বন করিতে হয়। তদনু-সারে প্রথমে নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রথমে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বস্তুতঃ জ্ঞানের পরানিষ্ঠা—ইহা পরমপদের প্রাথমিক সোপানমাত্র। ব্রহ্মভূত হইলে চিত্ত নির্মল হয়, শোক ও আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায় এবং সর্বভূতে সাম্যভাবের উদয় হয়, তখন পরাভক্তির উন্মেষ হয়—যাহার প্রভাবে পরম পুরুষের সাধারণ জ্ঞান জন্মায়। সর্বশেষে তাঁহার তাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলেই তাঁহাতে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ভগবানের এই পরম ধাম চন্দ্র-সূর্য-অগ্নির অতীত পরম দ্যুতিমান্‌। কেহ কেহ মনে করেন, এইটি ব্যুত্থানহীন নিরোধের বর্ণনা, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই অবস্থায় ব্যুত্থান যেমন থাকে না, নিরোধও থাকে না। কেহ কেহ ইহাকে নিত্যোদিত সমাধি বলেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সে অবস্থাও নহে। কারণ নিত্যোদিত সমাধিতে ব্যুত্থান ও সমাধির সামরস্য বিদ্যমান থাকে, যাহার বিবরণ 'ক্রমসূত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব বর্ণনা দেহবোধহীন দেহাবস্থাতেই প্রযোজ্য। পরমপদ ইহা হইতেও অত্যন্ত বিলক্ষণ।

বিষ্ণুর পরমপদ যেমন আছে তেমনি তাঁহার নিম্নতর অপর পদও

আছে। ঐগুলিও ভগবদ্ধাম। ঐ সব স্থান হইতে অবতরণ হয় এবং ফিরিয়া আসা যায়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, বিশেষতঃ, বৈষ্ণব সমাজে পরমপদ পরব্যোম, পরম-ব্যোম, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি নামেও ব্যবহৃত হয়। ইহা ভগবানের নিত্য বিভূতি। পূর্ব উল্লিখিত ভগবানের চারিটি পাদের মধ্যে ঊর্ধ্ব ত্রিপাদ নিত্যবিভূতি এবং অবশিষ্ট এক পাদ লীলা-বিভূতি। নিত্যবিভূতি অপ্রাকৃত, উদয়াস্তহীন ও স্বয়ং প্রকাশ। ঋগ্বেদে—'ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি' এবং 'বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ'—এইস্থানে নিত্যবিভূতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'স্বয়ং রজসঃ তমসঃ পরাকে'—ইহাও নিত্য বিভূতির বৈদিক নিদর্শন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার প্রসঙ্গ আছে।

এই পরমপদ সম্বন্ধে বহু মার্মিক কথা বলিবার আছে। পূর্বে যে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের প্রয়োগ করা হইল তাহা সামান্য অর্থে জানিতে হইবে। মাধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ অনন্ত আসন, শ্বেতদ্বীপ ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে কিছু ভেদ কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে পরমপদ 'দিবঃ পরঃ' নামে অভিহিত। পৃথিবীতে মহা মেরুকেই দ্যুলোক বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়, তদনু-সারে তাহার পরবর্ত্তী যে অনন্ত আসনে তাহাই—'দিবঃ পরঃ'। ইহাই পরম-পদ। আকাশে সূর্য্যমণ্ডলকে দ্যুলোক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহার পরবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপকে 'দিবঃ পরঃ' বলা যাইতে পারে। তদনুসারে শ্বেতদ্বীপও পরমপদ। দ্যুলোকে ইন্দ্রসদনকে তদন্তর্গত দ্যুলোক বলা হইয়া থাকে। তদনুসারে তৎপরবর্ত্তী বৈকুণ্ঠকে 'দিবঃ পরঃ' বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায় যে একই 'দিবঃ পরঃ' দৃষ্টিভেদে ভিন্ননামে অভিহিত হইয়াছে। পরমপদ এক ও অখণ্ড হইলেও লোকত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতি লোকের দ্যুঃস্থান বা ঊর্ধ্বতম স্থান হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হয়। সেইজন্য উহা 'দিবঃ পরঃ' নামে অভিহিত হয়। সেইজন্য অনন্ত আসন, শ্বেতদ্বীপ ও বৈকুণ্ঠ পরস্পর পৃথক হইলেও পরমপদ এক ও অভিন্ন। পরব্যোম ও পরমব্যোম শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। পরব্যোমের যে তিনটি পাদ আছে তাহার বিশেষ বর্ণনা মহানারায়ণ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে 'দিবঃ পরঃ' প্রসঙ্গে শ্বেতদ্বীপাদি তিনটি নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গে এই তিন বিভাগের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের নিত্যবিভূতি ত্রিপাদ ও লীলাবিভূতি এক পাদ। অখণ্ড বিরাট ব্রহ্মাণ্ডসমন্বিত প্রকৃতি এই একপাদ বিভূতির অন্ত-

র্গত। ত্রিপাদ বিভূতি ও একপাদ বিভূতির মধ্যবর্ত্তী যে ব্যবধান তাহাই বিরজা নদী অথবা কারণসলিল নামে খ্যাত। জীবের কারণদেহ এইখানেই বিগলিত হয়। সূর্যমণ্ডল ভেদ না করিয়া বিরজা পাওয়া যায় না। সূর্য-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া যায়। উৎক্রমণ কালে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া স্থূল দেহ ভেদ হয়। স্থূল দেহ ভেদ হওয়ার পর ব্রহ্মরন্ধ্র পথে সুষুম্না রশ্মিযোগে সূর্যমণ্ডলে গতি হয়। সূর্যমণ্ডল ভেদ করার পর বিরজা থাকিলে অবগাহনের সঙ্গে সঙ্গে কারণসলিল লীন হইয়া যায়। বিরজা হইতে উন্মজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ দেহের প্রাপ্তি ঘটে। তখন এই বিশুদ্ধ দেহেই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ ঘটে। বিশুদ্ধ দেহ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ। ইহাকেই পঞ্চব্রহ্মময় অথবা পঞ্চউপনিষদময় তনুও বলা হয়।

প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন আছে। এইপ্রকার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সাতটি আবরণ আছে। এই সকল আবরণের অতীত যে চিদানন্দময় মহা সত্তা বিরাজ করিতেছে, তাহাই পরমব্যোম বা দিব্যলোক বা বৈকুণ্ঠ। ইহা ব্রহ্মাদিরও বাক্-মনের অগোচর এবং সকল কার্য-কারণের অতীত।

পরমপদ কাহারও কাহারও মতে স্থানবিশেষ। স্বরূপ হইতে ভিন্ন। কাহারও কাহারও মতে স্বরূপ ও স্থানে সেখানে কোন ভেদ নাই। ইহা কোন প্রদেশে অনন্ত, কোথাও অবচ্ছিন্ন। ত্রিগুণও অনন্ত বটে কিন্তু ইহা ত্রিগুণা-তীত বলিয়া ইহার মহিমা অধিক। ইহা অচেতন হইলেও স্বপ্রকাশ। শাস্ত্রে এই স্থান সম্বন্ধে এইপ্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—'তত্রানন্দময়া ভোগা লোকাশ্চ আনন্দলক্ষণাঃ। আনন্দনামকং লোকং পরমানন্দলক্ষণম্। তয়োর্যো পরম ব্যোম নিস্বন্দবং সুখমুত্তমম্ ষাড়্গুণ্যপ্রসরো নিত্যঃ দিব্যঃ মঙ্গল-বিগ্রহঃ'। ভগবানের দিব্য মঙ্গলবিগ্রহ যেমন জ্ঞানাত্মক ইহাও তেমনি জ্ঞানা-ত্মক। তবে ইহা ধর্মভূত জ্ঞানের ন্যায় পরাক্, প্রত্যক্ নহে। কারণ ইহা অন্যের নিকট প্রকাশমান হয়। সুষুপ্তির সময় যেমন ধর্মভূত জ্ঞানের প্রকাশ থাকে না, তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায় শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশমান হয় না। বদ্ধাবস্থায় ইহার সিদ্ধি জ্ঞানের বিষয়রূপে হয়। মুক্তপুরুষগণের অত্যন্ত বৈভব হইলেও ইহা তন্নিরপেক্ষ। আত্মা যেমন জ্ঞানের বিষয় হইয়াও স্বপ্রকাশ ইহাও তেমনই।

কেহ কেহ বলেন যে শুদ্ধ সত্তাকে যে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয় তাহার কারণ এই যে ইহা অত্যন্ত দীপ্তিসম্পন্ন। ইহাকে যে জ্ঞান বলা হয় তাহার কারণ এই যে, এই জ্ঞানকে আবরণ করে না, এবং ইহাকে যে আনন্দরূপ বলা হয় তাহার কারণ এই যে, ইহা অনুকূল রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা স্বপ্রকাশও নহে, আনন্দও নহে। ইহা পঞ্চোপনিষদের প্রতিপাদ্য পঞ্চ-

ভূতেন্দ্রিয়ময়। প্রাকৃত জগতে যে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয় লক্ষিত হয় ইহা অপ্রাকৃত হইলেও তদ্রূপ পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয় রূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও নিত্যমুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছানুরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও বিষয় রূপে ইহা নিয়ত অবস্থান করে। এই শরীর প্রভৃতি কর্মজন্য নয় বলিয়া ইহাদিগকে জাগতিক দৃষ্টি অনুসারে শরীর-ইন্দ্রিয়-প্রাণ ও বিষয় বলা চলে না। ভট্টপরাশর পাদের মতে ঈশ্বরাদিরও মন আছে। শ্রুতিতেও আছে "মনসা এতান্ পশ্যন্ রমতে" "মনোঽস্য দিবং চক্ষুঃ" "সহ অন্যং কামং মনসা ধ্যায়েত" "মনসৈব জগৎ সৃষ্টম্"। পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কথাও আছে, ভূষণ আয়ুধ প্রভৃতি বিষয়ের কথাও আছে। লীলাভূমিতে এই সকল বৈচিত্র্য না থাকিলে লীলার সম্ভাবনা থাকে না। তাই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই এই সকল বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া লীলার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে যেমন চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সত্তা আছে তদ্রূপ অপ্রাকৃত সত্তাতেও অপ্রাকৃত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আছে। প্রাকৃত তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব আছে এবং এক তত্ত্ব হইতে অন্য তত্ত্বে পরিণাম নিয়ত ক্রম অনুসারে হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বেরও পরিণাম হয় ইহা সত্য, কিন্তু সেখানে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নাই অর্থাৎ এক তত্ত্ব হইতে ক্রম ধরিয়া অন্য তত্ত্বের আবির্ভাব হয় না। ভগবদিচ্ছায় অথবা মুক্ত পুরুষের ইচ্ছানুসারে সাক্ষাৎভাবে বিশুদ্ধ সত্তা হইতেই অভীষ্ট তত্ত্ব বা ভাবের পরিণতি ঘটিয়া থাকে।

শ্রুতিতে আছে দিব্য মঙ্গল বিগ্রহাদি সবই নিত্য। দিব্য বিভূতিতে শরীরাদির সংস্থান প্রায়ই প্রাকৃতেরই অনুরূপ। নিত্য বিভূতির অন্তর্গত কোন কোন বিষয় পরিণামহীন ও নিত্য এবং কোন কোন বিষয় পরিণামী ও জন্য অর্থাৎ অনিত্য।

নিত্য বিষয়ের মধ্যে ভূষণ, আয়ুধ, আসন, পরিবার ও আয়তন উদ্যান-বাটিকা ক্রীড়া-পর্বত প্রভৃতি ধরা হয়। পরিণামী বিষয়ের মধ্যে বৃক্ষস্থ পল্লব-কুসুমাদি, নদীতে কোন তরঙ্গাদি, বিগ্রহে ব্যূহ-বিভবাদি গণ্য করা হয়। পরিণাম থাকিলেও নিত্য বিভূতির পরিণাম কালকৃত নহে এবং কর্মাদিরও ফল নহে। একমাত্র ভগবৎ সংকল্পই ইহার মূল কারণ। নিত্য জীব ও ঈশ্বরের কোন কোন শরীর নিত্য এবং কোন কোন শরীর অনিত্য। নিত্য ইচ্ছা পরিগ্রহমূলক শরীরগুলিই নিত্য এবং অনিত্য ইচ্ছামূলক শরীরগুলিই অনিত্য। মুক্ত পুরুষগণের শরীর যখন উৎপন্ন হয় তখন উহা অনিত্য। মুক্ত পুরুষগণ কখনও অশরীর এবং কখনও সশরীর অবস্থায়

থাকেন। শ্রীভাষ্যে একথা আছে। নিত্য ধামের সকল ইন্দ্রিয়ই নিত্য, কারণ ইহা আকাশ প্রভৃতির ন্যায় উপাদান-নিরপেক্ষ সত্তা। তন্মধ্যে কতকগুলি নিত্য পুরুষগণ ও ঈশ্বর কর্তৃক অনাদিকাল হইতে পরিগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। মুক্তগণের ইন্দ্রিয়-পরিগ্রহ শরীর-গ্রহণের ন্যায় সাময়িক। নিত্য ও মুক্তগণের শরীরাদি পরিগ্রহ ভগবদভিপ্রেত তৎকৈঙ্কর্যরূপে ভোগের জন্য। তাছাড়া ভগবানের নিজ ভোগের জন্য ও নিজের অঙ্গীভূত নিত্যমুক্ত-গণকে আনন্দ-দানের জন্য এবং মুমুক্ষুর উপাস্যতা সিদ্ধির জন্যও জানিতে হইবে। ভগবানের এই শরীরাদি পরিগ্রহ কখনও কেবল মাত্র পরম পুরুষের সংকল্প হইতেই হয়, আবার কোনও কোনও সময় নিত্য সংকল্পের অনুসরণ কারী স্বসংকল্প হইতেও হয়।

বেদান্তদেশিক আচার্য "পরমপদ সোপান," নামে একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে পরমপদের মার্গে নয়টি অবস্থার কথা উল্লিখিত আছে। এই নয়টির মধ্যে বিবেক, নির্বেদ, বিরতি, ভীতিভাব ও উপায় এই পাঁচটি উপায়ের অন্তর্গত রূপে পরিগণিত হয়। এবং উৎক্রমণ, অর্চিরাদি, দিব্য দেশ প্রভাব ও প্রাপ্তি এই চারিটি আরোহের অন্তর্গত ধরা হয়। এখানে বিবেক শব্দে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মকে শরীরী অথবা আদিরূপে জ্ঞান করা। কর্ম ও পাপবশতঃ যে আন্তরিক অনুতাপ উহার নাম নির্বেদ। লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য এবং কৈবল্যে অনিচ্ছা—ইহার নাম বিরতি। সংসার-ভয়ের নাম ভীতিভাব। ভক্তি ও প্রপত্তির ফলে ভগবান্ ও গুরুর কৃপায় অহঙ্কার-নাশই উপায়, মুক্তি বলিতে শুধু অজ্ঞান, পাপ ও দুঃখের অভাব বুঝায় না, কিন্তু পরমপদের পুনঃপ্রাপ্তিও বুঝায়। আত্মা মুক্ত হইয়া মিলিয়া যায় না—ব্রহ্মরূপ, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মগন্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরমপদে কাল নাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে ঃ "কালং স পচতে তত্র ন কালঃ তত্র বৈ প্রভুঃ"—পরমপদ অপ্রাকৃত আনন্দলোক ও পরম আকাশস্বরূপ। ইহা অজড় জ্ঞানবৎ স্বপ্রকাশ ও আত্মার ভোগার্থ। দেশ ও কাল পরমপদে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই স্থান কোটি কোটি সূর্য হইতেও উজ্জ্বল—তাই বলা হয় "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। কৌষীতকী উপনিষদ ও রামানুজকৃত 'বৈকুণ্ঠ গদ্যে' ইহার কিছু বর্ণনা আছে।

'বৈকুণ্ঠ গদ্য' ও 'পরমপদ সোপানে' ভগবানের শ্রীবিগ্রহের বর্ণনা আছে। প্রাকৃত জগৎ (অচিৎ) তাঁহার শ্রীবৎস এবং অপ্রাকৃত জগৎ তাঁহার কৌস্তুভ। সেখানে দেহ-ধারণ বন্ধনাত্মক নহে, আনন্দের লীলামাত্র। নিত্যসূরিগণ পরম পদের যে অনুভব করেন, তাহাকে নিত্য বর্তমানের (Eternal Now) অনুভব

বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—"পরমপদ ব্যোম" শব্দে পরমপদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। রামায়ণে "তচ্চাকাশং সনাতনং" এবং মহাভারতে "দিব্যস্থানং অজনং চাপ্রমেয়ং" রূপে পরমপদেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই নিত্য সত্ত্ব ঊর্ধ্ব প্রদেশে অনন্ত এবং অধঃপ্রদেশে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে অপ্রাকৃত পঞ্চশক্তি খেলা করে বলিয়া ইহাকে পঞ্চশক্তিময় বলা হয়। যাঁহারা মনে করেন এই পরমপদ বা নিত্য বিভূতি প্রকৃতিরই একদেশ, তাঁহাদের মত সত্য নহে। ইহাতে রূপ-রস আদি সবই আছে। কিন্তু কোনটিই প্রাকৃত নহে, একথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বিভূতি আমোদ, প্রমোদ, সম্মোদ ও বৈকুণ্ঠ ভেদে চারি প্রকার। তারপর অনন্ত। ইহাতে দ্বাদশ আবরণসহিত গোপুর, প্রাকার প্রভৃতি দ্বারা আবৃত বৈকুণ্ঠ নামক নগর আছে, আনন্দ নামক দিব্য আলয় আছে, যাহার মধ্যে রত্নখচিত বহু সহস্র স্তম্ভ বিরচিত মহামণি মণ্ডপ নামক সভা আছে। এই স্থানে সহস্র ফণার মণির তেজসহকারে ভগবান অনন্ত বিরাজ করিতেছেন। অনন্তের উপর ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যময় পাদবিশিষ্ট একটি দিব্য সিংহাসন আছে, তাহার উপর চামর হস্তে বিমলাদি সখী অষ্টদল কমলকে সেবা করিতেছেন, তাহার উপরে প্রকৃষ্ট বিজ্ঞানমূলক শেষ বিরাজমান রহিয়াছেন, শেষের উপর বাক্য ও মনের অগোচর সেই পরম অব্যক্ত অদ্ভুত বস্তুটি রহিয়াছে।

ভগবানের অস্ত্র-ভূষণাদি সবই দিব্য। তাঁহার কৌস্তভ মণি ও শ্রীবৎসের তাৎপর্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। জাগতিক পরিভাষাতে যাহাকে বুদ্ধি বলে তাহাই তাঁহার হস্তস্থিত গদা, সাত্ত্বিক অহংকার শঙ্খ, তামসিক অহংকার শার্ঙ্গ, জ্ঞান খড়্গ। অজ্ঞান তাহার আবরক বা কোষ। মন চক্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের স্বরূপ শর বা বাণ। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসকল বনমালা।

কৌষীতকী উপনিষদে পর্যঙ্ক বিদ্যাতেও এবং শাণ্ডায়নী গণের শাস্ত্রে ভগবৎ স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা আছে, যাহা "ষড়র্থ সংক্ষেপে" আলোচিত হইয়াছে—"তদ্‌বিপ্রাসঃ" ইত্যাদি। শ্রীরামানুজের গুরু যাদব-প্রকাশ পরমপদ সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "অক্ষরে পরমে ব্যোমন্" এই স্থলে যে পরমব্যোম শব্দ আছে তাহা পরম পদের বাচক। উহা ত্রিগুণের পরিণাম এবং অব্যক্ত ও তমোগুণ উভয়ের অন্তরালস্থিত ঈশ্বর ও মুক্তপুরুষগণের ভোগস্থানস্বরূপ পশুর দ্বৈতাত্মক সংসারে বিসর্গ অবিদ্যারূপে ভেদ উন্মীলন করে। শিবের অদ্বৈত সংসারে উহা বিদ্যা রূপে অভেদ ভাব গ্রহণ করে। পরম শিবের সংসার ভেদাভেদ মিশ্র,

তাই এখানে বিসর্গ একই সময় বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় রূপে ভেদ ও অভেদ উভয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই সামরস্য। ইহা একটি অদ্ভুত রহস্য। সিদ্ধগণ বলেন, ভেদ ও অভেদকে এক দেখা ইহাও সংসার, এখানেও কলঙ্ক আছে। শুদ্ধ অন্তর্মুখ ভাবরূপ বিশ্রাম ইহাতে নেই। মহাবিন্দুই সংসারের দ্বারা অস্পৃষ্ট। ইহাই পরম অনুত্তরধাম। এইটিই পূর্ণ বিমর্শ স্বভাব ও মহা বিশ্রান্তি পন্থা। তথাপি ইহারও একটি পরাবস্থা আছে। মহাবিন্দুর সকল বা তুরীয় অবস্থাতে প্রপঞ্চ না থাকিলেও প্রপঞ্চের কামকলা অনুসন্ধান গন্ধ একেবারে উপশম প্রাপ্ত হয় না। তাহা হয়—ঐ পরাবস্থার নিষ্কল মহাবিন্দুতে, ইহাই পরম ব্যোম।

দেখা যাইতেছে সর্বত্রই সংসার বিদ্যমান—সংসারের বিশ্রাম একমাত্র শুদ্ধ মহাবিন্দু পদে। সেখানে সংসার নাই। ইহাই অন্তর্মুখ বিশ্রামের ভূমি, অনুত্তর পরম ধামস্বরূপ। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে মহাবিন্দুর দুইটি স্থিতি আছে, তন্মধ্যে প্রথমটির স্বভাব পূর্ণ বিমর্শ। বিমর্শই সংসারের উপাদান। তাই ইহা যদিও মহা বিশ্রান্তি পদবাচ্য সন্দেহ নাই, তথাপি ইহাতে সংসারের অনুসন্ধান-গন্ধ একটু একটু থাকে। ইহাই তুরীয় পদ। মহাবিন্দুর দ্বিতীয় স্থিতি পরম ব্যোমস্বরূপ। ইহা পঞ্চ আম্নায় পরিশোধিত নিষ্কল মহাবিন্দু তত্ত্ব, ইহা তুরীয়াতীত, ইহাই পরমপদ।

চিত্রকূটবাসী সন্ত মহাত্মা *সীতারাম দাস বাবাজী বলিতেন, মহা সত্তার মধ্যে তিনটি খণ্ড আছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ড মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পর শূন্য স্থান। শূন্যের পরে দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ড তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, এবং কোটি সূর্যের প্রকাশে উজ্জ্বল। অনেকে ইহা ভেদ করিতে পারে না। এখানে তাঁহারা তিনটি বিভাগের কথা বলিয়া থাকেন— প্রথমে অক্ষর, ইহা শূন্য স্থান। ইহা অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। ইহার পর নিরক্ষর, ইহা মহাশূন্যস্বরূপ, এইখানেও দুইটি পদ আছে। একটি সহজ পদ, অপরটি অচিন্ত্য পরব্রহ্মপদ। তারপর সর্বশেষে নিরক্ষরের অতীত স্থিতি। এই-খানেই সত্যলোকের অবস্থান। তারপর কুমারলোক এবং চরমে উমালোক। এই সবই পরম ধাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই হইল দ্বিতীয় খণ্ডের কথা। ইহার পর তৃতীয় খণ্ড। তাহার নাম পরমপদ। এইখানে সৎপদ, অলক্ষ্য পদ, অগম পদ (শ্রীকৃষ্ণপদ) ও অন্তে অনামী পদ (শ্রীরামপদ) অবস্থিত আছে। এই মতে অনামী পদই শ্রীরামপদ—ইহাই পরমপদের শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ।

বশিষ্ঠ সংহিতাতে পরমপদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে উহাকে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া গণনা করা হইয়াছে এবং উহা যে বিরজার পর-

পারস্থিত তাহাও বলা হইয়াছে। গোলোক ইহার পরবর্তী এবং ইহা সর্বে-ন্দ্রিয়গোচর। গোলোকের মধ্যস্থিত বিন্দুই সাকেত নামে পরিচিত। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অনুসারে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি সকল সাকেতের বিভিন্ন দিকে অবস্থিত।—পূর্বে মিথিলা, দক্ষিণে চিত্রকূট, পশ্চিমে বৃন্দাবন, উত্তরে মহা বৈকুণ্ঠ। মহা বৈকুণ্ঠে পার্ষদগণ সহ স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। সাকেতের সাতটি পৃথক্ আবরণ বর্ণিত হইয়াছে। দিব্য অযোধ্যার ভিতরে দ্বাদশটি বনের বর্ণনা আছে এবং তাহাদের পৃথক পৃথক নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

এইপ্রকারে বিভিন্ন গ্রন্থে পরমপদের বিভিন্ন প্রকার বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। মোটের উপর নিত্য লীলাবাদী ভক্তগণের সিদ্ধান্ত এই যে, কালের রাজ্যের পরে একটি চিন্ময় ও আনন্দময় নিত্য রাজ্য আছে। এই উভয়ের মধ্যে বিরজা অর্থাৎ কালিন্দী উভয় লোকের ব্যবধানরূপে বিদ্যমান আছে। এই বিরজাকে যদি কারণ-সলিল বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বিরজার পরপারস্থিত সমগ্রভূমি মহাকারণসত্তার অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রাকৃত ত্রিগুণের খেলা ঐ স্থানে নাই বলিয়া উহা অপ্রাকৃতরূপে বর্ণিত হয়। উহার উপাদান শুদ্ধ সত্ত্ব অথবা চিৎ ও আনন্দে উদ্ভাসিত নিত্য সত্তা। ভক্তগণের ভাব অনুসারে অথবা ভক্তাধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানের লীলাপোষক সংকল্প অনুসারে ঐ উপাদান আনন্দরূপ ধারণ করিয়া থাকে। ওখানে কালের প্রভাব নাই, অবিদ্যার আবরণ নাই—কর্মের বীজ ওখানে দগ্ধ হইয়া নির্বীজ ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকটমান। সৃষ্টি এবং প্রলয় কালরাজ্যের ব্যাপার, সুতরাং নিত্যধাম পরমপদে সৃষ্টি-সংহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

রস-ব্রহ্মের সাধনা

আমরা পূর্বে যে আলোচনা করেছি তাতে ভগবৎতত্ত্ব এবং ভগবৎতত্ত্বের আনুষঙ্গিক যা কিছু তা সংক্ষেপে একটু একটু বলেছি। তাতে আমরা পেয়েছি যে সত্তা, সেটা সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সেই সত্তাই ব্রহ্মরূপে, ভগবানরূপে এবং পরমাত্মারূপে আমাদের শাস্ত্রকারেরা, বিশেষতঃ মহাপুরুষেরা প্রতিপাদন করে গেছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব নামটা হয় কোন সময়েতে? যখন তার ভিতরেতে কোন গুণের প্রকাশ থাকে না এবং কোন শক্তির প্রকাশ থাকে না। তিনি নির্গুণ এবং নিঃশক্তিক—সেই যে সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব সেটাই হ'ল ব্রহ্মতত্ত্ব। আর যখন গুণের প্রকাশ হয় এবং শক্তির প্রকাশ হয় তখনই হয় সেটা ভগবৎতত্ত্ব বা পরমাত্মাতত্ত্ব। এই যে গুণ, এই গুণের প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম কখনও সগুণ সাকার হয়ে পরিণত হ'তে পারেন না, move করতে পারেন না। এইজন্য গুণের তত্ত্ব দরকার। ভক্তরা বলেছেন যে ৬৪ কলার প্রতি কলা, ৬৪ গুণ যদি নাকি পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়—অনন্ত গুণ তার মধ্যে আছে সেটা তো কেউ লেখাপড়া করতে পারে না কিন্তু যতটা হিসাব করেছেন যদি ৬৪ গুণের প্রকাশ থাকে—তা হলে এরূপ পূর্ণ প্রকাশ থাকলেই সেই যে তত্ত্বটি হয়, তাতে অনন্তশক্তির প্রকাশ হয়ে যায়। সেই তত্ত্বটিকে আমরা বলি ভগবান্—শুধু ভগবান্ নয়, স্বয়ং ভগবান্। অর্থাৎ তাঁর ভেতরেতে অনন্ত শক্তির প্রকাশ রয়েছে—এবং ৬৪ গুণের প্রকাশ রয়েছে—এর চেয়ে আর বেশীগুণের প্রকাশ হয় না। আমাদের জন্য যেটুকু দরকার সেই ৬৪ গুণই হলো শেষ। ৬৪ গুণের যদি প্রকাশ থাকে তাহলে অনন্ত শক্তির প্রকাশ হয়ে যায় এবং তখন তিনি স্বয়ং ভগবান্ নামে পরিচিত হ'ন। এই যে স্বয়ং ভগবান্ ইঁহাতে অনন্ত শক্তি আছে এবং ৬৪ গুণ আছে—কিন্তু যদি এই বস্তুই, (স্বরূপ সেই একই সচ্চিদানন্দ), তিনি যদি নিজে খেলার জন্য অথবা যে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই হোক্ না তার জন্য কিছু গুণ কম করেন—যেমন আমার গায়েতে ৪টা জামা আছে আমি ইচ্ছা করে ২টা সরিয়ে ফেলতে পারি তেমনিতর এই ৬৪ যে গুণ তার জায়গাতে যদি ৬০এর প্রকাশ হয় আর যদি ৪টা গুণের প্রকাশ না হয়—তখন তিনি মূর্ত বটে কিন্তু অনন্ত শক্তির প্রকাশ

তাতে হয় না। এই সমস্ত শক্তির কিছু কম থাকবে, কেননা এখানে গুণ তো কম কিনা। অনন্ত না হলেও লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শক্তি থাকবে। সেখানে তাঁর নাম হবে ভগবান্ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ হ'লো না। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য। স্বয়ং ভগবান্ যিনি তিনি অন্যনিরপেক্ষ, অন্যের অপেক্ষা নাই, আর ভগবান্ যিনি তিনি অন্যসাপেক্ষ, কেননা স্বয়ং ভগবানের ৬৪র মধ্যে তিনি মাত্র ৬০টি নিয়ে রয়েছেন তো। বড় হলে স্বয়ং ভগবান্ আর ৪টা গুণের কম হলে তার জন্য অপেক্ষা রাখতে হবে। তা হ'লে তৎসাপেক্ষ। প্রাপ্তির দিক দিয়েও বৈশিষ্ট্য আছে, স্বরূপের বি প্রকাশের দিক দিয়েও বৈশিষ্ট্য আছে। আবার অন্যদিক দিয়ে—শাস্ত্রকাররা বলেন, স্বয়ং ভগবানের বিলাস যিনি তিনি ভগবান্। স্বয়ং ভগবানই বহু হয়ে প্রকাশ হতে পারেন অথচ বিলাস নন্, এমনও হতে পারে—যেমন রাসলীলার সময়েতে এক শ্রীকৃষ্ণই অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণরূপেতে প্রকাশ হয়েছিলেন, কেননা প্রত্যেক গোপীর সংগে এক একটি কৃষ্ণ ছিল। সেই কৃষ্ণ এবং মূল কৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণের যে কৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণ আর এই কৃষ্ণ কি আলাদা—ভিন্ন ভিন্ন? তা নয়—একেবারে এক, এমন কি গুণেতেও তারতম্য নেই—শক্তির বিকাশেও তারতম্য নেই—সেই একই এক। তাহা যে বহু—বহুত্বের নাম হচ্ছে প্রকাশ—একে technically বলে প্রকাশ—সুতরাং প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে যে কৃষ্ণ ইনি হলেন স্বয়ং মূল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ—স্বয়ং ভগবান আর তিনি একই বস্তু—কোন পার্থক্য নেই। কেবল এইটুকু পার্থক্য ওটি মূল আর এটি ওর থেকে সরে রয়েছে। যেমন দর্পণের মধ্যে যদি সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে তাতেও সূর্য দেখা যায়, তাহ'লেও সে মূল সূর্যের সমান নয়, সে একটু ন্যূন। কিন্তু এখানে সে ন্যূনতা থাকে না—ন্যূনতা যদি থাকে তাহ'লে তার নাম হয়ে যায়—বিলাস। আর ন্যূনতা যদি না থাকে তাহ'লে তার নাম হয় প্রকাশ। এ দুই-ই সম্ভবপর। ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভবপর। ভগবানে আছে ৬০টি গুণ, আরও যদি ৪টি গুণ কম হয়, যেমন আমি ৪টি জামার মধ্যে ২টো সরিয়ে নিয়েছি, আর ৪টি যদি সরিয়ে নেই, তেমনিতর ভগবান্ থেকে যদি আরও ৪টি গুণ সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহ'লে হয় ৫৬ গুণ—অর্থাৎ ৫৬ গুণ-যুক্ত। স্বরূপ কিন্তু একটাই—যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে পরিচিত, সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপই স্বয়ং ভগবানরূপে পরিচিত, আবার সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপই ভগবান্ নামে পরিচিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম কেন?—না, এক জায়গাতে তার গুণ কিংবা শক্তির মোটেই প্রকাশ নেই, তার নাম হ'ল ব্রহ্ম—এক জায়গাতে তার গুণ ৬৪ পূর্ণ গুণ এবং তাঁর শক্তি অনন্ত—সমগ্র শক্তি

যেখানে প্রকাশমান তার নাম হ'ল স্বয়ং ভগবান্। আর এক জায়গাতে তাঁর গুণ অপেক্ষাকৃত কম—৬৪'র থেকে কম ৬০ এবং শক্তিও অপেক্ষাকৃত কম তাঁর নাম হ'ল ভগবান্। এর থেকে যদি গুণ আরও কম হয়—৫৬ গুণ যদি হয়, তখন তিনি হলেন পরমাত্মা। পরমাত্মা যখন আসলেন তখন আর ভগবান্ নাম থাকবে না।

এই পরমাত্মাতে কোন্ শক্তির প্রকাশ হবে? ঐ যে অনন্ত শক্তি বলেছি —ঐ স্বরূপশক্তির আভাসটা প্রকাশ হবে এবং জীবনশক্তি ও মায়াশক্তি প্রকাশিত হবে। অনন্তশক্তি হলেও শক্তি তিনভাবে বিভক্ত—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ এবং তটস্থ—অন্তরঙ্গ শক্তি হচ্ছে স্বরূপশক্তি, যেটা স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে—বহিরঙ্গ শক্তি হচ্ছে মায়াশক্তি, যেটা স্বরূপের বাহিরে বাহিরে থাকে, আর তটস্থ শক্তি হচ্ছে জীবনীশক্তি এবং এই তটস্থ শক্তি, স্বরূপ এবং মায়ার মাঝখানে থাকে। তটস্থশক্তি হ'ল জীবশক্তি—তার মানে, যে শক্তির দ্বারা পরমাত্মা থেকে জীব-অণুর নিরন্তর নির্গম হচ্ছে সে হ'ল তটস্থ শক্তি—আর বহিরঙ্গ শক্তি হল মায়া, যা নাকি জীবের স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং কারণদেহের উপাদানস্বরূপ—এই হ'ল পার্থক্য—এই মনে রাখতে হবে। এই মায়াটা দেখতে পাওয়া যায় কোন্ সময়েতে? যখনই নাকি তিনি ৫৬টি গুণ নিয়ে মূর্ত হন, প্রকাশিত হন, যার নাম হচ্ছে পরমাত্মা—তিনি পরমাত্মা—তিনি পরমাত্মারূপে যখন প্রকাশ হন তখন পরমাত্মা হন মায়া এবং জীবের অধিষ্ঠাতা। অর্থাৎ তিনি মায়াকে এবং জীবকে অধিষ্ঠান ক'রে থাকেন। সাধারণতঃ ভগবান বললে যা বুঝি, তিনি মায়াকে ক্ষুব্ধ করেন এবং জীবকে দেহ দান করেন এবং সেই জীব মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে স্থূল দেহে, সূক্ষ্ম দেহে, কারণ দেহে লোকলোকান্তরে সঞ্চরণ করে। এই জগতে তা'কেই সংসারী জীব বলে। এই হলো পরমাত্মার ব্যাপার। কিন্তু পরমাত্মার ৫৬ গুণের থেকেও যদি কম গুণ হয়—সবই তো সম্ভবপর সেখানে—তাঁকে ঈশ্বরকোটী বলবো না। স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বরের মধ্যে এবং পরমাত্মা ও পরমেশ্বরের—৫৬ ভাগের থেকে যদি কম হয় তখন সে জীবপদবাচ্য—জীব উচ্চকোটীর জীব কিন্তু তাকে পরমাত্মা বলা যায় না। সে পরমাত্মার অংশ—পরমাত্মা তখন অংশী এবং জীবাত্মা তাঁর অংশ এবং সে কে যাঁর ভেতরেতে সম্পূর্ণ গুণ আছে?—সম্পূর্ণ গুণ যে ৫৬র চেয়ে বেশী গুণ, এখানে প্রকাশ হয় না, কেননা এর চেয়ে বেশী গুণ প্রকাশ হ'লে সে ভাব থাকে না, এই হচ্ছে কথাটা। ইংরাজীতে যেমন বলি না continuum discreet—discreet যেগুলো, যেগুলো খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো, আর যেটা continuum

সেটা হচ্ছে অখণ্ড—তেমনিতরো যখন নাকি ৫৬ গুণ-এর সম্পূর্ণ প্রকাশ, তখনই সেই গুণের থেকে জলের ফোয়ারা যেমন হয়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন হয়, তেমনি তার থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হয়—এই স্ফুলিঙ্গের মধ্যে ৫৬র থেকে কম গুণ থাকে, যেমন ৫৫ আরও কম, আরও কম, একটি গুণ পর্যন্ত হতে পারে—নিম্নতর lowest species পর্যন্ত একটা গুণ থাকবেই—একেবারে গুণশূন্য হতে পারে না—একটু কিঞ্চিৎ শক্তি—যতই গুণের আধিক্য হবে ততই তাঁর মূর্ত্তি দৃষ্ট হবে এবং ততই তাঁর শক্তির বিকাশ বেশী হবে—এই রকম করতে করতে ৫৫ গুণ পর্যন্ত জ্ঞানের বিকাশ এবং সেই অনুসারে শক্তির বিকাশ হয়।

এবং সেই ৫৫ থেকে ৫৬ গুণে যে যায় গুরুকৃপাতে বা ভগবৎকৃপাতে, তা হ'লে সে divine statusএ পৌঁছে যায়—যদিও divine statusএর মধ্যেও একটা gradual progression আছে কিন্তু divine status এসে গেলে আর তখন সে মায়ার দ্বারা অভিভূত হবে না এবং ordinary জীবকোটীতে সে থাকবে না।

এই অবস্থার মধ্যেও দুটো জিনিষ আছে—যদি সে শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই গুণকে অতিক্রম করে তাহ'লে তার কি হয়? না, সেই নির্নিমেষ দৃষ্টি, যে-দৃষ্টিতে কোন বিচিত্র দর্শন হয় না অথচ অখণ্ড—এক অবিভক্ত সত্তার দর্শন হয়—সেই জিনিষটা যদি হয়, তা হলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় সেই জ্ঞানেতে। সেই জ্ঞানটা কার জ্ঞান? না, ত্বম্ পদার্থের জ্ঞান—জীবেরই জ্ঞান। কি রকম জীবের জ্ঞান? না, জীব as one with Brahma—ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের যে অভেদ রয়েছে সেই অভেদের জ্ঞান যেটা, সেটাই হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা—এই জ্ঞানেতে দেখে কি? সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দ প্রকাশমানকে দেখে? না, সে নিজেকেই দেখে। সে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে—সে নিজেকেই নিজে দেখছে, সে হ'ল একটা জ্ঞান। আর একটা জ্ঞান আছে, যদি সে জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় এবং ভক্তিভাবের উদয় হয়—জ্ঞানটা যদি বিজ্ঞানে পরিণত হয়—'জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা'। ভগবান গীতায় বলেছেন, শুদ্ধ জ্ঞান নয়—বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট জ্ঞানটা হচ্ছে ভক্তিযুক্ত জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানটা যখন ভক্তির আকারে পরিণত হয়েছে—জ্ঞান সেই একটাই, সেটা ব্রহ্মজ্ঞানই কিন্তু তখন ব্রহ্মজ্ঞান না,—পরব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মা জ্ঞান অথবা ভগবদ্-জ্ঞান অথবা স্বয়ং ভগবদ্-জ্ঞান কিন্তু তখন ত্বম্ পদার্থের জ্ঞান হয় না—তৎ পদার্থের জ্ঞান—তৎ পদার্থ হচ্ছে পরমেশ্বর। যদিও পরমেশ্বর এবং জীব অভিন্ন—

অভিন্ন দিকটা নির্ণয়েব দৃষ্টি তার দ্বারা সে জানতে পারে কিন্তু যদি নাকি সে ভাগ্যক্রমে অপাঙ্গ বীক্ষণবৎ বিচিত্রময় দৃষ্টি যদি প্রাপ্ত হয় গুরু-কৃপাতে অর্থাৎ ভক্তির দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানই ভক্তিরূপে পরিণত যখন হয়, সেই দৃষ্টি নিয়ে যখন সে দেখে তখন সেই অখণ্ড সামান্য বস্তু—সামান্য বস্তুর মধ্যেই অনন্ত—সে দেখতে পায়, এটা হলো ভক্তির দর্শন। এ হলে হয় সালোক্য দর্শন—সামীপ্য হয়, তার পরেতে সাযুজ্য হয়—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সব হয়—সক্রিয় হচ্ছে সালোক্য, তারপর হয় সারূপ্য, তারপর হয় সার্ষ্টি—তারপরে সামীপ্য, তারপরে সাযুজ্য এবং তার মধ্য দিয়ে ঐশ্বর্য সব আসে, পরমাত্মার যে ঐশ্বর্য—ঐশ্বরিক বিভূতি সেগুলো সব আসে। তবে তাঁরা গ্রহণ করেন না।—তাঁরা দাসের মত সেবা করেন—সেবাব্রতই তাঁরা চান। ভগবান তাঁদের সবই দেন; তবে তাঁরা তা' গ্রহণ করেন না, এবং বলেন, আমরা এ দিয়ে কি করবো, আমরা তোমার সেবা করবো।

ভক্তি দুই রকমের—এক হচ্ছে সেবারূপা ভক্তি আর এক হচ্ছে প্রেমরূপা ভক্তি—সেবারূপা ভক্তি প্রথম সাধনরূপেতে আসে আর তার ফলেতে প্রেমরূপা ভক্তি—ফলরূপা যে ভক্তি সেটা তখন আবির্ভূতা হয় এবং তা'র মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে। এখন দেখা গেল, এই যে পরমাত্মা—পরমাত্মা পর্যন্ত জীবের ঊর্ধ্বগতি এবং জ্ঞানের দ্বারা সে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেল কিন্তু পর-মাত্মার যে বৈশিষ্ট্য সেটা সে অনুধাবন করতে পারলো না। আর যদি ভক্তি-রূপা যে বিদ্যা—যে বিদ্যার দ্বারা যদি সে দেখে তাহ'লে একটু রকমভেদ তার মধ্যে রেখে দেয়—যে ভেদের বলেতে পরমাত্মাকে উপাসনা করে—পর-মাত্মার সেবক হয়ে সারূপ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি সে লাভ করে। ভক্তিলাভ করে ক্রমশঃ তারা যাবে কোথায়?—তারা যাবে ভগবদ্ধামেতে—ভগবদ্ধাম হ'লো কোনটা? না ভগবানের ধাম হলো যেটা, সেটা দুটো মিলিয়েই ভগবদ্-ধাম। ভক্তি হচ্ছে দুই রকমের : এক ভগবানের যে স্বরূপভক্তি—স্বরূপ-শক্তি কি? সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী—এই দুই মিলিয়ে একত্র হয়ে তা'র যে সারাংশ যেটা, সেটার নাম হচ্ছে ভক্তি। ভক্তি কাকে বলে? ভগবানের স্বরূপশক্তির যে সম্বিৎ অর্থাৎ চিৎশক্তি এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি, যে শক্তির দ্বারা তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং যখন এই দুইটা combined হয়ে যায়, এই দুইটি এক হলে তার যে essence অর্থাৎ সারাংশ সেটার নাম হচ্ছে ভক্তি।

এই হ'ল ভক্তি বস্তু—এই ভক্তি বস্তু আছে কোথায়?—আছে ভগবদ্-ধামে এবং স্বয়ংভগবদ্ধামে—স্বয়ংভগবদ্ধামেতে আছে মুখ্য প্রেম ভক্তি-রূপেতে আর ভগবদ্ধামে এটা বৈধী ভক্তিরূপেতে। বৈধী ভক্তির স্থান

কোনটা ? না, বৈকুণ্ঠ অথবা বৈকুণ্ঠের স্থানকল্প বা ভাবকল্প যে কোন স্থান হোক্ না কেন অর্থাৎ যেখানে ভগবানকে পরমেশ্বর রূপেতে দেখা যায়। অপরোক্ষ জ্ঞান হয় এবং ভগবানকে ভালবাসা হয় কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে একটা sense of respectful distance থাকে—দাস্যভাবটা সেখানে প্রকাশ হয় —ভগবানকে প্রভু বলে বুঝতে পারে—এই হ'ল বৈধী ভক্তি এবং সে যখন সেবা করে—চাকর যেমন প্রভুর সেবা করে—ঠিক সেরকম ভগবানের আদেশ সে পালন করে—তিনি যখন যা করতে বলেন সে তাই করে এবং সেইভাবেই সে সেবা করে এবং সেটা সে কর্তব্য বলে জানে—বিধির বিধান বলে জানে —এবং এইরূপ করতে করতে ভক্তের আস্বাদনগুলো বেড়ে যায়। আর ভগবানের মাধুর্যরূপা ভক্তির প্রকাশ যেখানেতে সেখানেতে প্রেমভক্তির প্রকাশ হয়—একটা হ'ল ভক্তি করা উচিত, গুরুজনের আদেশ পেয়ে করা, এটা হ'ল বৈধীভক্তি। রাগময় ভক্তি সেরকম নয়, সেটা হচ্ছে pure love—spontaneous love—ভগবানকে এমন ভালবাসা যে সে রুখতে পারে না—ভালবাসা যদি background এ থাকে শাস্ত্র, বেদ বেদান্ত কিছুরই মূল্য নেই সেখানেতে। ভগবান গীতাতে বলেছেন—'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—প্রাণের সরল ভক্তিতে যদি দেওয়া যায় ভগবান্ তাই গ্রহণ করেন—এটা হ'ল রাগময়ী ভক্তি। এখানে কোন বিচার নেই—ভক্তের যেটা ভাল লাগে ভগবানেরও সেটা ভাল লাগে। যেমন কোন নিয়ম নেই। এই ভক্তিকে লক্ষ্য করেই "God is Love" বলা হয়। ভক্তের ইচ্ছাই সেখানে মূল—ভগবান গ্রহণ না করে পারেন না। ভগবানের সেই যে aspect সেটা হচ্ছে স্বয়ং ভগবান—সেটা হচ্ছে মাধুর্যময়রূপ।

ভক্তিরাজ্যে ভগবানের আলোচনা করতে গেলে দুইটি রূপ দেখতে হবে, যদিও তাঁর অনন্তরূপ। একটা রূপ হল স্বয়ং ভগবান, তিনি মাধুর্যপ্রধান, তাঁতে ঐশ্বর্য আছে, পূর্ণ ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু ঐশ্বর্যটাকে তিনি ঢেকে রাখেন মাধুর্যের দ্বারা। এই হ'ল একটা দিক। তিনি শিশু সেজেছেন শিশুই থাকেন। মা যদি তার দুষ্টুমির জন্য তাকে মারতে যায় তাহ'লে সে পালাবার চেষ্টা করে কেননা শিশু সেজেছেন যখন শিশুর মত ব্যবহার করতে হয়, তা না হলে নরলীলাকে উপেক্ষা করা হয়। তাঁর শিশু সাজবার কি দরকার ছিল ? —তিনি তো ভগবান, পূর্ণরূপে আছেনই। যখন শিশু সেজেছেন শিশুর মত খেলবার জন্য তখন তাঁকে শিশুর মতনই সেখানে থাকতে হবে। সেখানে যদি তিনি ঐশ্বরিক শক্তি দেখান তাহ'লে

রসভঙ্গ হয়। কাজেই মাধুর্য ভক্তির মধ্যে বৈধী ভক্তির অনুষঙ্গ আছে বলে, কেননা ভগবানের মাধুর্য যেখানে সেখানে ঐশ্বর্যও আছে, কিন্তু ভক্ত যদি নাকি মধুর ভাবের উপাসক হয় তাহ'লে ভগবানের সেই ঐশ্বর্যের দিকটা ঢাকা পড়ে যায়। ভগবান যতই বড় হ'ন না কেন, রাগময় যে ভক্তরুচি, যে ভাবের ভিতরেতে যথার্থ real ভাব রয়েছে তার কাছে ভগবান সত্যি সত্যি বড় হ'লেও তিনি পরোয়া করেন না, তিনি তাকে ভালবাসেন—তাকে সখারূপে ভালবাসেন—সে কি দেখবে যে বিশ্ব জগতের সে মালিক? তা সে দেখতে পারে না—তাতে ভক্তিসাধনার ব্যাঘাত হয়—মাধুর্যময় ভক্তের এই হ'ল বৈশিষ্ট্য। আর ঐশ্বর্যময় ভক্ত যে সে ভগবানকে পিতারূপে দেখতে পারে, গুরুরূপে বিশ্বের অধিষ্ঠাতারূপে দেখতে পারে—তার মধ্য দিয়ে মাধুর্যভাবের উদয় হতে পারে—মাধুর্য ভক্তের মধ্যেও ঐশ্চর্যের ভাব একটু একটু উদয় হয় কিন্তু যোগমায়ার খেলা......এমন আছে যে তিনি লীলাকে পুষ্ট করবার জন্য তিনি সেইভাবে থামিয়ে দেন। যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন—ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়েছিলেন—যশোদা কোথায় তাকে মারতে যাচ্ছে দুষ্টুমির জন্য আর যেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখল তখন তাকে প্রণাম করতে লাগলেন—রসভঙ্গ হয়ে গেল না কেন? শিশু—নিজের ছেলে মা তাকে মারতে পারবে না দুষ্টুমির জন্য—সে কি নিজের power দেখাবে? আমি এত বড়—তা কি হয় কখনও? তখনই যোগমায়া বলেঃ তুমি একি করছ—শিশু তুমি—শিশুর মত খেলা কর। নরলীলা অপেক্ষা ক'রে তাকে চলতে হবে। এটা স্বাভাবিক নয়। এটা কোন্ সময় হয়?—ভগবানের সঙ্গে ভগবানের নিত্য পরিকর তাদের সঙ্গে হয় এটা। ভগবান যেমন আছেন—তেমনি তার সঙ্গী আছে তেমনি তার লীলাও আছে—এতগুলি জিনিষ আছে—সবগুলি কিন্তু নিত্য—ভগবান নিত্য, ভগবানের যে দেহ তাও নিত্য,—তার পরিকর যে আছে—পরিকর মানে সেবক—নানারকমের সেবক। যখন তিনি দেহ ধারণ করেছেন তার উপযোগী সব রকমের পরিকর আছে, তারাও নিত্য—তাদের দেহও নিত্য—সেখানে কাল নেই অথচ কাল আছে, কেননা খেলার জন্য কাল দরকার হয়—এটা হচ্ছে লীলাপরিকর—কালও নিত্য—যখন যেখানে যে রকমের লীলা হয় সেখানে সেইরকমের কালের প্রকাশ হয়।

ভগবানের যে লীলা তার মধ্যে যে মাধুর্যময়ী লীলা সেই লীলাই হ'ল শ্রেষ্ঠ। মাধুর্যময়ী লীলা মানে যে লীলাটা হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানের প্রেমটা প্রকাশ করবার জন্য। এই প্রেমতত্ত্বটি বুঝবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

বলেছি। প্রথমে দেখুন যে রতি—রতি মানে ভাব—ভগবানের দিকে উন্মুখ হয়ে যে চিত্তের ভাবটা ওঠে, যেটা পরে প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের মূল যেটা সেটা প্রথমে বুঝতে হবে। ভাবটা ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। এই যে রতি বা ভাবটা এই ভাবের একটা qualitative difference আছে। মাত্র একটা qualitative difference গুণগত পার্থক্য বা ভেদ আছে এটা প্রথমে বুঝা দরকার।

ভাবের qualitative difference কি? না, ভাবের গুণগত যে বৈচিত্র্য এটা হচ্ছে quantitative difference—আর qualitative difference কি? না, ভাবের প্রাবল্যের, intensityর যে তারতম্য। ভাবটা হ'ল প্রেমভাব তো! সেটা আর কিছু না—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ—ভালবাসা, এটাই হচ্ছে কথা, কিন্তু সেই যে ভালবাসা তার মূলেতে থাকে ইচ্ছা—কৃষ্ণের প্রতি প্রণয় থাকা বা তাঁকে দেখবার জন্য আকাঙ্খা, তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য আকাঙ্খা, তাঁর দেহের গন্ধ পাওয়ার জন্য আকাঙ্খা, তাঁর আজ্ঞা পালন করবার জন্য আকাঙ্খা ইত্যাদি সব রকম ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সঙ্গে লীলাক্ষেত্রেতে নিজের ইচ্ছার 'টক্কর' বা সংঘর্ষ বা বিরোধ লাগতে পারে—clash হতে পারে। নিজের ইচ্ছা অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা—যেটা নাকি সাধারণতঃ মানুষের হয়। আর এই যে মাত্রারুত ইচ্ছা—শুদ্ধ নির্মল ইচ্ছা—এই দুটোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে—একটা অবস্থাতেই হয় নিজের ইচ্ছা, কিনা, আনন্দের জন্য সেটাকে প্রবল থাকতে দেওয়া হয় না—ভগবানের যে ইচ্ছা সেটাই হয় প্রবল। এটা হ'ল একটা অবস্থা। আর একটা হচ্ছে ভগবদ্-ইচ্ছা যেখানে প্রবল নয়, নিজের ইচ্ছাও যেখানে প্রবল নয়, কিন্তু বিধি যেখানে প্রবল, বিধান যেখানে প্রবল—এই তিনটা ভাবে সেটা প্রকাশ হয়। লীলার মধ্যে দুই দিকের ইচ্ছা থাকে—এক ভগবানের দিকের ইচ্ছা থাকে আর ভক্তের দিকের ইচ্ছা থাকে কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে ইচ্ছা নেই—এটা মনে রাখতে হবে। ব্রহ্মস্বরূপের ইচ্ছা থাকে না।

ভেদস্বরূপ তিনি যখন খেলতে নেমেছেন, তাঁর ইচ্ছা থাকবে না? তাঁরও একটা ইচ্ছা আছে, আর ভক্তের সঙ্গে খেলবেন, ভক্তেরও একটা ইচ্ছা আছে। কিন্তু ভক্তের ইচ্ছা যদি এইরকমের হয় যে ভগবানকে আমি ভালবাসব, কেননা ভগবানকে ভালবাসাতেই আমার আনন্দ, তাহ'লে সেই ইচ্ছাটা যদি প্রেমে পরিণত হয় সেটা হ'ল একজাতীয় প্রেম—আর একজন হ'ল ভগবানকে আমি ভালবাসব—ভগবানের ভালবাসাতে আমার আনন্দ হোক্ বা না হোক্ that is no question। আর আমি ভগবানকে ভালবাসব তাতে ভগবানের আনন্দ

হয় কি না হয় that is no question। কিন্তু ভগবানকে ভালবাসা আমার duty, আমার কর্তব্য—গুরু নানক এই বলেছেন, শাস্ত্র এই বলেছেন—পতি পত্নীকে ভালবাসবে, এটা বিধিমতের কথা, এ একটা অবস্থা। এখানে কর্তব্যই বড় হয়ে দেখা দেয়—আমি ভালবাসতে চাই কি না, এটা বিচার করে না—আমার ভালবাসা ভগবান্ চান কি না, এটাও সে বিচার করে না—আমার কাজ আমি করব—আমার কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে ভালবাসা। ভালবাসা মানে তাঁকে সেবা করা—তাঁর আজ্ঞা পালন করা ইত্যাদি। আর একটা হ'ল ভগবানকে ভালবাসলে আমি আনন্দ পাব এ ভাবটা নেই, আর ভগবানকে ভালবাসা আমার কর্তব্য, এ ভাবটাও নেই। কিন্তু ভগবান আমাকে চান এটা আমি জানি—আমাকে পেলে তিনি খুশী হন এবং তাঁর আনন্দের জন্য তাঁর সুখের জন্য আমি তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে থাকব—আমার যদি ভাল না-ও লাগে তাহ'লেও আমি করব, তাতে আমার যদি ভাল না-ও হয়, অমঙ্গলও যদি হয়, তাও আমি করব, কেননা তাঁর ইচ্ছা সেটাই পূর্ণ হোক্। এটাও নয়, অথবা ধর্ম—প্রতিপালিত হোক এটাও নয়—ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ বা God thy will be done—সেটাই আমার ইচ্ছা—এই তিনটা ভাব।

প্রথমটা বললাম আমার নিজের আনন্দের জন্য আমি ভগবানকে চাই। ভগবানকে উপাসনা করব, ভগবানকে ভজন করব, ভগবানের সেবা করব—এটা করতে করতে ক্রমশঃ আমার মধ্যে আনন্দ বাড়বে তাতে এত আনন্দ······যে ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত তুচ্ছ হয়ে যাবে—এতো বিশাল আনন্দ তাতে পাবো—এটাও কিন্তু স্বার্থপরতা। আমার নিজের আনন্দকেই দেখছি সেখানে—এই রীতির নাম হচ্ছে সাধারণী রতি অর্থাৎ ভগবানকে ভালোবেসে আমি আনন্দ পাবো। আমার নিজের আনন্দ যেখানে মুখ্য এবং আনন্দ পাবার অন্য কোন উপায় নেই—উপায় হচ্ছে ভগবানকে ভালবাসা—ভগবানের জন্য ভগবানকে ভালবাসা নয় অথবা কর্তব্য পালনের জন্যও ভগবানকে ভালোবাসা নয় কিন্তু আমি আনন্দ পাবো বলে এই লোভেতে আমি ভগবানকে ভালোবাসি। এটা হচ্ছে lowest form of ভগবৎপ্রেম। আর একটা রতি আছে, তারাও ভক্ত, তারা ভগবানকে ভালবেসে আমি আনন্দ পেলাম কি না পেলাম সেটা বড় কথা নয় —আমার কর্তব্য ভগবানকে ভালোবাসা—সেবা করা—এটা আমার ধর্ম—আমি আনন্দ পাই বা না পাই সেটা আমি দেখবো না—এ এক ধরণের mentality আছে এই যে রতি এর নাম হলো সমঞ্জসা রতি। আর এক রকমের লোক আছে, তা'রা বলে, আমি আনন্দ পাবো কি না পাবো এ আমি বিচার করতে চাই না—ভগবানকে ভালোবাসলে আমার স্বর্গলাভ হবে এরও আমি পরোয়া

করি না—নিজের আনন্দের পরোয়াও আমি করি না, তা হলে আমি কিসের জন্য চিন্তা করি? না, তিনি আমাকে চান, তাঁকে তৃপ্ত করার জন্য আমি তাঁকে ভালোবাসি—আমার তৃপ্তির জন্য নয়—আমার তৃপ্তির consideration সেখানে নেই—আমার অমঙ্গলেও যদি তা'তে হয় এবং তাঁর যদি তৃপ্তি হয় সেটাই আমার লক্ষ্য, কেননা যাকে ভালোবাসি তাঁর ইচ্ছাটাই সেখানে প্রধান, এর নাম হচ্ছে সমর্থা রতি।

তাহ'লে তিন রকমের রতি আছে—একটা হ'ল সাধারণী, একটা হ'ল সমঞ্জসা, আর একটা হ'ল সমর্থা। সমর্থা রতিই হ'ল শ্রেষ্ঠ রতি। সাধারণতঃ পৌরাণিকরা বলেন, সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুব্জা, সমঞ্জসা রতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে দ্বারকার মহিষীবৃন্দ, আর সমর্থা রতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রজ-গোপী—তারা নিজের আনন্দের পরোয়া করত না, ধর্মের পরোয়া করত না।

Qualitative difference জানা এইজন্য দরকার—এই যে রতি যেটা, যেটা ভাব, এর যেটা উচ্চতম ফল সেটা সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমি যে স্কুলে পড়ছি তাতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়া যায়, তারপর I.A. পড়বার জন্য কলেজে যেতে হয়, আবার এমন স্থানও আছে যেখান থেকে স্কুল থেকে শুরু করে I.A., B.A. এমনকি তার পরেও পড়া যায়। প্রথমে যে রতি তা বেশীদূর যায় না—তারপর সমঞ্জসা রতি আরও কিছুদূর নিয়ে যায় আর সমর্থা রতি একেবারে মহাভাব পর্যন্ত নিয়ে যায়। তিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কাজেই আমার দরকার হচ্ছে মহাভাব—মহাভাবের ঊর্ধ্বে আছে রাধাতত্ত্ব—রাধাতত্ত্ব হচ্ছে Perfect Love—Perfect Love যদি বলা চলে—মহাভাব না হলে সেটা হয় না—মহাভাবের ভিতরেও অনেক তারতম্য আছে—সর্বপ্রথম হচ্ছে ভাব, তারপরে মহাভাব—ভাবের থেকে মহাভাব পর্যন্ত যে transition সে transition comes through different steps। তার কতকগুলো step আছে—পরপর অবস্থা। কিন্তু সেই step পর্যন্ত যাওয়া প্রত্যেক লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, possible না। যেটা নাকি সাধারণী রতি সে মহাভাব পর্যন্ত উঠবেই না—অর্ধেক পথ যেতে যেতে শুকিয়ে যাবে সে। সুতরাং ঐ যে love প্রেম, যাকে Divine Love দিব্য প্রেম, ভগবৎ প্রেম বলছি—ঐ loveএর, ঐ প্রেমের দ্বারা ভগবানকে নিজে বশীভূত করতে পারে। এইজন্য ওটাকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়—Divine Love বটে—ভগবৎ প্রেম বটে সন্দেহ নেই—অন্য জগতের কোন জিনিষের আকাঙ্খা নেই—সুতরাং সেটা বড় জিনিষ তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু বড় হলেও তবু তো স্বার্থ আছে। কি স্বার্থ সেটা? না, নিজের আনন্দ

হবে তাতে—এই অহংটা যতই clear করা যাবে ততই না ভগবৎস্বরূপের নিকটবর্তী হওয়া যাবে। আমি সংসার চাই না—এই যে বিরাট ঐশ্বর্য আছে সেটাও আমি চাই না—কিছু আমি চাই না কিন্তু ভগবৎ-আনন্দটা চাচ্ছি তো। আমার সমস্ত দুঃখও যদি হয় তাতে আমার ক্ষতি নেই, এমন মনোবৃত্তি যদি না হয় তাহ'লে মহাভাব পর্যন্ত যাওয়া যায় না। রাধাতত্ত্ব অত সহজ জিনিষ নয়—নিজের ভাবটার একটু লেশ পর্যন্ত যদি থাকে তা' হলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না—কৃষ্ণকে পাওয়া অত সস্তা জিনিষ নয়। কাজেই যা নিয়ে ধরব সেই জিনিষটা যদি নির্মল না হয় তাহলে অতদূর পর্যন্ত তা'র বিকাশ হবে কি করে? একটা হচ্ছে qualitative difference যার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সমর্থা রতি না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত মহাভাব পর্যন্ত যাওয়ার কোন অধিকার নেই। আর মহাভাব পর্যন্ত না গেলে সেই যে ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ, সেটার অধিকার নেই। সুতরাং এই যে সমঞ্জসা যারা রয়েছেন, তাদেরও রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার নেই। কাজেই আমি আনন্দ পাব, ঐশ্বর্য পাব, সেই ভাব নিয়ে রাসে ঢোকা যায় না। আমার নিজের আনন্দ এবং নিজের পুণ্যবল ঐহিক এবং পারত্রিক, সব কিছু sacrifice করতে পারলে সমস্ত কিছু sacrifice ক'রে একমাত্র তাঁর ইচ্ছাকে অনুসরণ করা যায়, সেই প্রেমটি, যে প্রেমের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই ভাব লাভ করা যায় সেটাই হচ্ছে প্রকৃতভাব, শুদ্ধভাব, সেটার নাম হচ্ছে সমর্থা রতি এবং সেই রতির যদি culture করা যায় তাহলে in distant future একসময়েতে মহাভাব পর্যন্ত উঠতে পারে, তা না হলে মহাভাব পর্যন্ত ওঠে না। যে কোন প্রেমের দ্বারা সেখানে যাওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন হ'ল—এই সমর্থা রতিটা প্রকাশ হয় কোথায়?—historic instanceএতে বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের মধ্যে কোনসময় সেটা হয়েছিল। নিত্যধামে সর্বদাই আছে,—এখনও আছে। সেই জিনিষটারই reflection-এর মত এই জগতে প্রকাশ হয়েছিল। নিত্যধামে সবসময়েই আছে—এই জগৎপ্রপঞ্চে দ্বাপরের অন্তে কলিতে এর প্রকাশ হয়েছিল। নিত্যধামে সব-পৌরাণিকদের বিশ্বাস। কাজেই সাধনা করে কেউ যদি নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে—কৃষ্ণ historical ছিলেন কি ছিলেন না? এটা তো আলোচ্য বিষয় নয়—এতো আজকালকার historianদের আলোচনা এগুলো নয়। কৃষ্ণকে পেতে হলে তাঁকে তত্ত্বরূপে পেতে হবে এবং তাঁকে পেতে হলেই ভাবের দ্বারা তাঁকে আনতে হবে। ভাবের দ্বারা কৃষ্ণকে সমঞ্জসা রতিতেও পাওয়া

যায়। কিন্তু কৃষ্ণের পরমস্বরূপ যেটা সেটা পাওয়া যায় না, কেন পাওয়া যায় না? সেখানেতে নিজের অহংভাবটা সম্পূর্ণ obliterated হয়নি। এজন্য যতক্ষণ নিজের অহংভাবটা সম্পূর্ণরূপে মুছে না গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" একথা বলতে পারা যায় না, কেননা আমার ইচ্ছা তো একটা রয়েছে এবং সে ইচ্ছা পূর্ণতেই তো আনন্দ—সেটা লৌকিক হতে পারে আবার অলৌকিকও হতে পারে। যে ভালোবাসার কাছে স্বয়ং ভগবান্ মাথা নীচু করেন, অতখানি ভালবাসার জোর যেটা—সে ভালোবাসার জোর কোথায়, যতক্ষণ আমার মধ্যে ego রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত অহং রয়েছে। কাজেই সময়মত একটা মহিমা রয়েছে। এই যে বৃন্দাবন যেটা, সেটা হলো একটা ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্রতে এই প্রেমের লীলা, যা আমাদের historicalভাবে একসময় হয়েছিল এবং নিত্যরূপে যারা পায় হৃদয়েতে তারা নিরন্তরই পায়।

এই ক্ষেত্রটি বোঝবার জন্য এখন কিছু কিছু বলব। মহাপ্রভুর দিক থেকে বলে যাচ্ছি—একটা হচ্ছে প্রেম যেটাকে বলে সেটা—একটা হচ্ছে শান্ত, একটা হচ্ছে দাস্য, একটা হচ্ছে সখ্য, একটা বাৎসল্য, একটা মাধুর্য—এই ক'টা তাঁরা ভাগ করেছেন। এর মধ্যে যেটা শান্ত ভক্তি বা শান্ত প্রেম, সেই শান্ত প্রেমের প্রকাশটা বৃন্দাবনে হয় না। শান্ত প্রেম এবং অশান্ত প্রেম এই দুইরকমের। শান্ত প্রেমে দোলা নেই—যে প্রেমেতে লীলায় প্রবেশ হয় সেটা ভাবযুক্ত প্রেম —এতে কল্লোল আছে, তরঙ্গ আছে—এটা হচ্ছে চাররকম: সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য, সুতরাং দাস্যের থেকেই হচ্ছে লীলায় প্রবেশ। এই যে 'নিত্য কৃষ্ণদাস জীব' কৃষ্ণের নিত্যদাস চৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন, তা'র সার্থকতা হচ্ছে এই। শান্ত প্রেমটা কাদের? না, বৈকুণ্ঠেতে সনক, সনন্দন এই যে চারজন তাঁদের যে ভগবৎপ্রেম সেটা হচ্ছে শান্ত প্রেম। বৃন্দাবনতত্ত্ব বুঝতে হলে এই চারটা বুঝতে হবে—প্রথমেই হচ্ছে দাস্যভাব—দাস্যভাব নিয়েই সখ্য-ভাবেতে ওঠা যায়—সখার যে ভাব সেটা দাসের কাছ থেকে পায়। দাসের কাছ থেকে সেবা, দাস্যের যে সেবাধর্ম, সেটা সখার মধ্যে আসে কিন্তু সখ্যের আর একটা ভাব আছে যেমন confidential talk—অন্তরঙ্গ ভাবেতে মেশা, এভাব দাস পাবে না। দাসের মধ্যে চাকরভাব আছে তাই দূরত্বটা রাখতে যায়, দূরত্বটা কমে যায় সখ্যের মধ্যে কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে একটু দূরত্ব থাকে কিন্তু সেটাও থাকে না বাৎসল্যের মধ্যে—প্রথমেতে ভগবান্ বড় আমি ছোট, দ্বিতীয়তে ভগবান্ আমি সমান সমান—তৃতীয়তে ভগবান ছোট আমি বড়। প্রভু পিতারূপে হতে পারেন, মাতারূপে হতে পারেন, গুরুরূপে হতে

পারেন, বিশ্বস্রষ্টা রূপেও হতে পারেন—যে ভাবেই হোক্ না কেন তিনি বড় আমি ছোট। সখ্যের মধ্যে সমান সমান।

মধুরভাব যখন হ'ল তখন তার মধ্যে সবগুলো ভাব একত্র হয়ে সমষ্টি হ'ল, তা ছাড়াও আর একটু কিছু থাকল। এটা সর্বাত্মক অথচ সর্বাতীত—সেটা হচ্ছে মধুরভাব অর্থাৎ ভগবানকে নিজের প্রিয় বলে মনে ক'রে আপন ক'রে নিয়েছেন এই হ'ল শ্রীকৃষ্ণের রতি। গতকাল বলেছিলাম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বটাই হচ্ছে ভগবানের আনন্দতত্ত্ব, কেননা সচ্চিদানন্দের সৎটা চিৎ-এ যায়, চিৎটা আনন্দ হয়ে যায়, এবং সেই আনন্দ যখন বিগ্রহরূপ ধারণ করে, মূর্ত হয়ে প্রকাশ হয়, তখন তার নাম শ্রীকৃষ্ণ আর তার যে শক্তি—একটা সৎ-এর শক্তি সন্ধিনী, একটা চিৎ-এর শক্তি সম্বিৎ, আর একটা আনন্দের শক্তি হ্লাদিনী—আনন্দটি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ আর হ্লাদিনীটি হচ্ছেন রাধা। হ্লাদিনী শক্তি হলেন স্বরূপশক্তি—এই হ্লাদিনী শক্তির মধ্যে সম্বিৎ শক্তিও আছে, সম্বিৎ শুধু নয়, সন্ধিনী শক্তিও আছে এবং তার অন্তরঙ্গভাবে অনন্ত কোটি কোটি শক্তি আছে সব। সবই স্বরূপশক্তির অন্তর্গত, হ্লাদিনীর মধ্যেই আছে। এই হ্লাদিনীর সারাংশটা—তাকে বলে ভক্তি বা প্রেম। সুতরাং প্রেম বস্তুটার যেটা নাকি মূর্তরূপ, সেই হচ্ছে রাধাতত্ত্ব। এই যে কথা আছে না "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ, অন্যথা বিশ্বমোহোপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ" চিরকালই এই কথাটা রয়েছে। রাধার সঙ্গে থাকলে তিনি মদনমোহন আর রাধা ছাড়া একলা কৃষ্ণ যদি হন্ তিনি মদনমোহিত। রাধার সঙ্গে যুক্ত না হলে কামদেবের দর্প চূর্ণ করা সম্ভব হয় না, কেননা স্বরূপশক্তির সঙ্গে যোগ থাকা চাই। সাধারণভাবে একটা দৃষ্টান্ত দিই—আপনি সংসারের লোক—সংসারে অভাব অনটন আছে—একজন লোক যদি ১০ লক্ষ টাকা আপনাকে দেয় এবং সেই টাকা দিয়ে বাড়ী, ঘর প্রভৃতি করতে পারেন, সেটা আনন্দ তো বটে। কিন্তু সেই সময়েতে আপনি যদি একজনকে বলেন ভগবান দর্শন করিয়ে দেব এবং সেই দর্শন চিরস্থায়ী হবে, সেই আনন্দ যদি আপনি পান তাহলে ১০ লক্ষ কেন ১০ কোটি টাকাও যদি আপনার কাছে থাকে তবে তখন তা আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। অত বিরাট আনন্দ যা আপনার স্বরূপকে ডুবিয়ে দিয়েছে সেখানে ১০ লক্ষ টাকার আনন্দ আনন্দ নয়—তেমনিতর শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে যখন থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে যদি রাধা থাকে এই যে যুগল স্বরূপটি হয়, রাধাযুক্ত যে কৃষ্ণ তা'র কাছে সব কামনা তুচ্ছ।

প্রাকৃত জগতের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল কে বলতে পারেন ? কাম। কামদেব তিনি সব দেবদেবীর দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে একটা প্রসিদ্ধি আছে।

শিব জ্ঞাননেত্রর দ্বারা, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কামদেবকে ভস্ম করে দিয়েছিলেন—তাঁর রূপটা অপরূপ, তাঁর রূপের মতো রূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নেই—কোথাও নেই—এর থেকে সুন্দর রূপ হতে পারে না। কিন্তু তিনি ভস্ম করে দিলেন তো! তারপর শিবের অনুগ্রহেতে সেই কাম আবার অঙ্গপ্রাপ্ত হলেন, রূপপ্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি হলেন নবীন মদন, অপ্রাকৃত নবীন মদন—সেই রূপের তুলনা নেই।—সে রূপ কার? বলতে পারেন সে রূপ কার? সেইটিই হ'ল শ্রীকৃষ্ণ—এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের বীজই হচ্ছে কামবীজ। সুতরাং সেই অপ্রাকৃত নবীন মদন যে অর্থাৎ যাকে আর জ্ঞানের দ্বারা ভস্ম করা যায় না—জ্ঞানের অতীত বস্তু, কেননা জ্ঞানের পরে সে আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দ, সতের পরে চৈতন্য, তারপরে হচ্ছে আনন্দ। সুতরাং আনন্দের ঘনীভূত রূপ মূর্তিরূপেতে যখন তিনি প্রকাশিত হয়েছেন তখন এই প্রাকৃত কাম যে, যতই তার রূপ হোক্, যতই তার মোহন উপায় বা কৌশল থাক না কেন, কিছুই করতে পারে না যদি সেই রূপেতে স্বরূপশক্তি খেলা করে। স্বরূপে যদি স্বরূপশক্তি খেলা না করে তাহ'লে থাকাও যা না থাকাও তাই, কেননা শক্তির খেলা না থাকলে সেটা না থাকারই সমান। এই স্বরূপশক্তির নাম হচ্ছে রাধা,—হ্লাদিনী শক্তি—এজন্য বলেছেন 'রাধাসঙ্গে যদাভাতি'—রাধার সঙ্গে যখন তিনি প্রকাশমান হন্ তখন মদনমোহন—মদনকেও তখন মোহিত করে। আর অন্যথা যখন রাধাকে বাদ দেওয়া হয়,—রাধা অন্তর্লীন হয়ে গেছেন তখন 'বিশ্বমোহোঽপি'—তিনি জগৎকে মোহিত করতে পারেন কিন্তু স্বয়ং মদনমোহিত। রাধা সঙ্গে থাকলে প্রাকৃত কাম কিছু করতে পারে না। এই জন্য রাসলীলার এত মহিমা। রাসলীলার সূক্ষ্ম রহস্য হচ্ছে এখানে—রাধাযুক্ত কৃষ্ণের সঙ্গে সেটা রয়েছে—স্বরূপশক্তির সঙ্গে যদি বিকাশ না থাকে তাহ'লে রাসলীলা হ'তে পারে না। স্বরূপশক্তিটিই হচ্ছে রাধা। কি শক্তি? হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা অর্থাৎ আনন্দের লীলাটা হচ্ছে নিজের শক্তির সঙ্গেই তো। দ্বিতীয় তো সেখানে কিছু নেই,—সবই তো তাঁর শক্তি, অনন্ত শক্তি। খেলা কিসের জন্য? না, ভিন্ন ভিন্ন রকমের আস্বাদনের জন্য এবং সেই রস জগতের লোক আস্বাদন করতে পারবে। সেইজন্যেই খেলা।

খেলার জন্য চাই একটা ধাম—তার নাম হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম। সেটা প্রথমে তৈরী হয়। সেটা তৈরী করে কে? তৈরী করে সন্ধিনী শক্তি এবং সম্বিৎ শক্তি। অপ্রাকৃত নূতন সৃষ্টি,—এ তো ব্রহ্মাদির সৃষ্টি নয়। অপ্রাকৃত সৃষ্টি ধাম তৈরী হয়। ধামটা সচ্চিদানন্দময়—তাঁর দেহটা যেমন সচ্চিদানন্দময়। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁর ধামও অনন্ত—তাঁর ধাম যে—

যে ধামে তিনি প্রকাশ হ'ন; কোটি কোটি যোজন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কিছুই না তার কাছে। তার সীমা নেই—এত বিশাল। সে তো আমাদের প্রাকৃতের মধ্যে নয় যে স্থান কোথায়, তা তো নয়—সেই যে অনন্ত ধাম তার প্রকাশ হয়, সেই অনন্তধামে অনন্তরকমের লীলা হয়, সমস্তগুলো beyond the ব্রহ্মাণ্ড, transcendental আর কি। Cosmic systemএর বাইরের যে ব্যাপার এমন সমস্ত খেলা হচ্ছে সেখানে। যারা ভক্ত তারা সেই ভাবের সম্বন্ধ নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারে—অন্যের প্রবেশের অধিকার কোথায়? এমন কি জ্ঞানীও প্রবেশ করতে পারে না। জ্ঞানী তো মুক্তি পর্যন্ত যেতে পারে, তার পরেও আর যেতে পারে না। এই যে ধামের প্রকাশ সেই ধামের মধ্যে যেটা highest ধাম, সে—highest কোনটাকে বলব? যেখানে মাধুর্য রূপের প্রকাশ। ঐশ্বর্যের প্রকাশ যেটা সেটা হছে বৈকুণ্ঠ আর ঐশ্বর্যের থেকে মাধুর্যের যে transition হয় সেই transitionএর মধ্যে তিনটে স্তর এঁরা স্বীকার করেছেন—একটা বলে দ্বারকা, এ দ্বারকা মানে আমাদের গুজরাটের দ্বারকা নয়। এ ধামগুলো আমাদের জগতের দিক্ থেকে নিয়ে একটা বুঝবার জন্য এ দ্বারকা ধাম। দ্বারকার পরে যাচ্ছি মধুপুরী অর্থাৎ মথুরা। মথুরার পরে যাচ্ছি গোকুল—সংক্ষিপ্তভাবে ধরতে গেলে বৃন্দাবন। —সেখানেই চরম উৎকর্ষ, মস্তকের পরেই রয়েছে গোলক, কাজেই এ হচ্ছে ভগবদ্‌ধাম।

এখন যে রকমের ধাম সে রকমের লীলা, এবং লীলার উপযোগী পরিকরও সেই রকমের। যেমন নাটক অভিনয় করতে হবে তার যেমন actor-actress যা তা তার অনুরূপই হবে। অন্যরূপ হবার উপায় নেই। পরিকর হচ্ছে ভগবানের সাথী—সাথী মানে লীলার সাথী—তিনি খেলছেন ত খেলার সঙ্গে যারা সাথী হবে তারাই হচ্ছে তাঁর পরিকর। যেমন দরকার সেইরকম পরিকর হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিকর। অন্তরঙ্গ লীলার পরিকর আলাদা, বহিরঙ্গ লীলার পরিকর আলাদা।

এই যে বৃন্দাবন বা গোকুল যেটি, এটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির যে বিকাশ অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির যে বিকাশ সেই বিকাশ দিয়ে রচনা সমস্ত রাজ্যটি। এর মধ্যে চার রকমের রস বলেছি, তার মধ্যে সকলের বাইরে যে রসের প্রকাশ সেটা হচ্ছে দাস্যরস—দাস্যরস মানে তার বহুরকমের সেবক আছে। তারা নিত্যভক্ত, তাদের দেহও নিত্য। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ভগবানের অথবা যুগলপ্রভুর আদেশ পালন করা এবং তাদের সে আস্বাদন সেরকমভাবে হয়। আবার অন্তরঙ্গ ভক্ত আর একটু ভিতরে যখন আসে, সেখানে হচ্ছে

যেমন পিতা আছেন, মাতা আছেন, তার পরেতে মামা আছেন, মাসী আছেন, পিসী আছেন, যতরকমের মানুষের সম্পর্ক ঠিক তার অনুরূপ সম্পর্ক শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাকে নিয়ে সব রয়েছে—লীলা আস্বাদনের জন্য এসব দরকার। যার যা মনের ভাব ভগবান তা গ্রহণ করেন এবং ভগবানকে পান তিনি। ভগবান কারও হচ্ছেন ছেলে, কারও হচ্ছেন ভাইপো—লীলাতে অনন্ত সম্পর্ক আছে—এও হ্লাদিনী শক্তির থেকেই রচনা। তারপরেতে হ'ল কি ? না, সখা—এই যে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, মধুমঙ্গল, সুবল অসংখ্য সব সখা আছে। নর্মসখা আছে, প্রিয় নর্মসখা আছে—কত রকমের সখা আছে। অনেক সখা আছে, তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা চলে—ইয়ার তারা। যেমন মধুমঙ্গল—মধুমঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন serious কথা হয় না, গুরুগম্ভীর আলোচনা হয় না—হাসিঠাট্টা সবসময় চলে সেই মধুমঙ্গলের সঙ্গে। আবার সুবল হ'ল এমন সখা যে সখার সঙ্গে অতি গুহ্য confidential কথা শ্রীকৃষ্ণ বলে থাকেন। আবার সুবলের সঙ্গে যে ধরনের কথা হয় শ্রীদামের সঙ্গে সে ধরনের হয় না। প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এক সখ্যভাবের ভিতরে-তেই। এই রকমের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কথাও সব আছে। এইসব ভাব সমস্ত গোকুলধাম—বৃন্দাবন যেটি তার একটু ভিতরে।

আরও একটু ভিতরে, আর interest যেখানে, সকলের অন্তরঙ্গ যেখানে সেখানে হচ্ছে কুঞ্জের ব্যাপার—অসংখ্য কুঞ্জ আছে—সংখ্যাতীত কুঞ্জের ৩৬০ কুঞ্জ, কিন্তু really কুঞ্জ অনেক বড়। এই যে সহস্রদল কমল যেমন বলে, সহস্র মানে অসংখ্য, তেমনি সহস্র কুঞ্জ মানে অসংখ্য। প্রত্যেক সখীর একটি করে কুঞ্জ আছে। যখন সে নিত্যদেহ প্রাপ্ত হবে তখন তার ভবনের প্রত্যেকের ভাব অনুসারেতে নিজের একটা কুঞ্জ থাকে। এইসব যে কুঞ্জ সেই কুঞ্জের যে ঘেরা কেন্দ্রটি সেই centreএ কেন্দ্রে যেমন মৌমাছির মধুচক্র ঠিক তার centreটা, তেমনি যেটা সেটা হ'ল নিকুঞ্জ। এই যে কুঞ্জগুলি এই কুঞ্জের ভিতরেতে আছে নিকুঞ্জ—নিকুঞ্জ যে স্থানটা সেটা একমাত্র রাধাকৃষ্ণের জন্য। রাধা এবং কৃষ্ণ এই যুগল ভিন্ন সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি অন্তরঙ্গ সখীরা চারিদিক দিয়ে, বাইরের দিক দিয়ে থাকে, ভিতরে যেতে পারে না—তার বাইরে ভিন্ন ভিন্ন সখীর ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জ আছে—ললিতার কুঞ্জ আলাদা আছে—বিশাখার কুঞ্জ আলাদা আছে, চিত্রার কুঞ্জ আলাদা আছে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জ আছে। কেন্দ্রে বা centreএ যিনি আছেন তিনি কে ? না, যুগল—এই যুগলের সঙ্গে প্রত্যেক কুঞ্জের সম্বন্ধ আছে। এখন যে লীলাটা হয়, ভগবানের লীলা যেটা হয়, সেটা হয় বাইরের থেকে নিয়ে। এই যে

লীলাচক্র—এই লীলাচক্র চমৎকার, পৃথিবীতে এমন জিনিষ কোনখানে নেই। বুঝেই বা কে? লীলাচক্রটি ক্রমশঃ ক্রমশঃ গুটিয়ে আসে। অষ্টকালীন লীলাকুঞ্জ ভঙ্গ যখন হয়, সে সময় থেকে লীলাটা আরম্ভ হয়, তারপরেতে মহানিশা—মহারাত্রির সময়েতে সে লীলা সমাপ্ত হয়। লীলা সমাপ্ত যখন হয় তখন এই কুঞ্জ এবং বাইরের যে সমস্ত নাকি কেন্দ্র সব অর্থাৎ এই সমস্তগুলো গুটিয়ে আসে। এই সমস্তগুলো রাধার কায়ব্যূহ। যখন এই লীলাটা সংকুচিত হয়ে আসে তখন এই লীলা শেষ হয়ে আসে—গোষ্ঠলীলা বলুন, মধ্যাহ্নলীলা বলুন, অপরাহ্নের লীলা বলুন—এই সমস্ত লীলাগুলো শেষ হয়ে আসে। সবগুলি যখন শেষ হয়ে আসে তখন একমাত্র নিকুঞ্জ খোলা থাকে, আর কুঞ্জগুলো সমস্ত অব্যক্ত হয়ে যায়। কুঞ্জগুলো অব্যক্ত হয়ে গেলেই তখন কি হয়? সমস্ত সখী—এই সখীগুলি নর্মসখী—নর্মপ্রিয় সখীতে পরিণত হয়। তখন নিকুঞ্জেতে অষ্টসখী মাত্র থাকে।—অষ্টভাব, যাদের সমষ্টি নিয়ে হচ্ছে রাধার মহাভাব, সেটা তখন থাকে, আর বাইরের জিনিষ কিছুই তখন থাকে না। থাকেন কেবল সখীরা। তখন কি হয়? সমস্ত সখীগুলির সমষ্টি নিয়ে রাধার কায়াতে প্রবেশ হয় অর্থাৎ রাধাই পূর্ণ হয়ে প্রকাশমান হন, সখীরা তখন আর থাকেন না। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই যে রাধা তিনি তখন নিকুঞ্জে প্রবিষ্ট হন। নিকুঞ্জে প্রবিষ্ট হলেই তখন আর কে আছে সেখানেতে? আর কেউ নেই। সখীদের মধ্যে এক শ্রেণী আছেন, তাঁরা শুধু দ্রষ্টা মাত্র। সখী তাঁরা কিছুক্ষণ থাকেন, তারপর দ্রষ্টাও থাকে না—দ্রষ্টা-দৃশ্য দুইই মিলিয়ে যায় তখন রাধা যে (নিকুঞ্জের ভিতরের ব্যাপার) সেই রাধার রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেতে এক হতে থাকেন। হতে হতে এমন একটি সময় আসে যখন সম্পূর্ণ রাধার স্বরূপটি ডুবে গেল, এক কৃষ্ণ মাত্র রইল, আর কিছু নেই, তখন কৃষ্ণও থাকেন না। রাধা তো চলেই গেলেন কৃষ্ণেতে, যেমন ইন্ধনে আগুন জ্বলছে,—সেই আগুনের দ্বারা ইন্ধন পুড়ে যায়, তারপর ইন্ধন যদি শেষ হয়ে যায়, অগ্নি যে ইন্ধনকে দগ্ধ করে তারপরে অগ্নিও থাকে না কেননা অগ্নি কার জন্য থাকবে? শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যখন প্রকাশ হয়েছেন তখন রাধাকে ধরে। রাধা যখন লীন হয়ে গেলেন, তখন আর কৃষ্ণ থাকবেন কার জন্য? কৃষ্ণও থাকতে পারেন না। রাধা ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যান, লীন হয়ে গেলে থাকেন একমাত্র কৃষ্ণ একটা ক্ষণের জন্য। তারপর কৃষ্ণই বা কোথায়? থাকে কে? তখন রাধকৃষ্ণ মিলিয়ে একটা বস্তু সেটা। সেই একটা বস্তু বা জিনিষ কি? সেটার নাম হচ্ছে রস—রসটা থাকে, তখন 'রসো বৈ সঃ'—অখণ্ড ব্রহ্মের রসরূপেতে তখন তিনি থাকেন। লীলার থেকে অদ্বৈতে গিয়ে প্রবেশ হয়ে গেল,

কিন্তু সে চিদদ্বৈত নয় রসাদ্বৈত। অদ্বৈতে প্রবেশ হয়ে গেল মানে এই যে অদ্বৈতে প্রবেশ হ'ল এই রসের থেকে পুনর্বার নিকুঞ্জ হলে যেমন হয়। মানুষ যেমন ঘুমিয়ে পড়ে, সুষুপ্তির মধ্যে যেমন সব একাকার হয়ে যায় কিন্তু আবার যখন জাগে তখন জাগ্রতের মধ্যে ব্যাপ্তি সব ফুটে ওঠে, তেমনি-তর এই লীলাময় বৈচিত্র্যগুলো আবার ওঠে, আবার শুকসারী জাগে, আবার কুঞ্জভঙ্গ হ'ল।

যদি বলেন, ফুটেই যদি উঠল তবে ডুবে যেয়ে লাভ কি? লাভটা কি, আমি সহজে একটুখানি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে বিরহ এবং মিলন—এই বিরহটা হচ্ছে কিসের জন্য? বিরহ এবং মিলন দুইটা নিয়েই তো নিলয়। বিরহেও প্রকাশ হবে, মিলনেও প্রকাশ হবে—বিরহের পরেতে মিলন আছে, বিরহের পরেতে আবার মিলন হবে কিন্তু তারতম্য আছে—প্রথমত মিলনেতে যে আনন্দের বিকাশ হবে তার পরেতে বিরহ হয়, তার অনুরূপ দুঃখ ভোগ হয়, দুঃখ ভোগ হয়ে তারপরে যে মিলন হ'বে তার আগের মিলনের চেয়ে গাঢ়তর সে আনন্দ—এই গাঢ়তর আনন্দের পরে যখন আবার বিরহ হবে তখন আগের বিরহেতে যে দুঃখ হয়েছিল তার থেকে গভীর দুঃখবোধ হবে—আগেকার দুঃখ তার কাছে কিছুই নয়। তারপর যে মিলন হবে, এই যে আনন্দের নামান্তর সব ad infinitum এক ব্রহ্মের মধ্যেই তো সব—ব্রহ্মের মধ্যে আনন্দ রয়েছে —ব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ কিন্তু সামান্য রূপ তার মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে, eternal progression তো রয়েছে—eternal progression হলেও তো সেটা ব্রহ্মের মধ্যেই, তাছাড়া তো কিছু নয়, তার মধ্যে যে আনন্দ আছে নিতি নব নিতি নব, নিরন্তর নূতন নূতন আস্বাদন যেটা সেটা তো চাই। সেটা কি করে হয়? বিরহ যখন আসে বিরহেতে দুঃখও আসে আবার বিরহেতে মিলনও আসে—সে মিলনও পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন স্বরূপানন্দ। সেটা ক্রমশঃ অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। আর ব্রহ্ম যেখানে আছে সেটা কূটস্থ, backgroundএ আছে—সেটা এক ভাবেতে আছেন—একের মধ্যেই অনন্ত।

সুফীরা বলতেন তিনটা journeyর কথা। তাঁরা বলেন একটা হল journey from God to man, একটা হল journey from man to God, আর একটা journey within God। এই তিনটা journey আছে—from God to man সৃষ্টির সময়েতে সকলেই তো সেখানেই ছিল, সৃষ্টির সময়েতে এই প্রপঞ্চেতে এসে গেছে এটা হল journey from God to man—আবার যখন সাধনার দ্বারা তাঁর কৃপাতে তারা ফিরে যায় তখন journey from man to God। তারপরেতে Godএ গিয়ে তো সেখান থেকে ফিরবে না—

Godএর মধ্যেই অনন্ত journey আছে—journey within God। এই যে লীলাতে journey, এটাই within God। বিরহটা তো আর বাইরে নয়, তাঁরই ভিতরে। এই ভগবদ্‌বিরহ ব্রহ্মা বিষ্ণু ধারণাই করতে পারে না, এটা কি? এই বিষয়ে রূপ গোস্বামী, পণ্ডিত মাধব প্রভৃতিরা আলোচনা সব করে গেছেন, সব দেব দেবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি সত্য বিরহ সহ্য করবার ক্ষমতা রাখেন না, তার সঙ্গে মিলনের যে আনন্দ বোধ হয় কোটি কোটি ব্রহ্ম একত্র হলেও সেই আনন্দটা ধারণ বা সহ্য করতে পারবে না—কি যে আনন্দ কল্পনা করাই যায় না, সেটা বলবার কোন মুখ নেই এত বড় সে জিনিষটা অথচ within the divine—divine এর ভিতরেতেই আস্বাদনটা within the divine—আস্বাদনকারী যে সেও divine আস্বাদনের বস্তু যে সেও divine। এক ভগবান নিজের মধ্যে নিজের আস্বাদন করছেন। এই যে যখন মার সঙ্গে কথা হচ্ছিল অদ্বৈত আনন্দ—অদ্বৈত আনন্দ কি?—সেটা নিজেই নিজের মধ্যে আনন্দটা আস্বাদন করছেন, দ্বিতীয় কোথায়? অথচ অনন্তরূপে করছেন এক রূপে নয়—অনন্তরূপে করছেন অনন্তরূপেতে অনন্তকালে যাতে বাইরে প্রকাশ পায়। সেইটা সেখানে প্রকাশ পাচ্ছে, অথচ একের মধ্যে। সেই যে বললাম না journey within the divine। যে divineটা এক, সেই একের মধ্যেই অনন্তের আস্বাদন হচ্ছে। এটা হচ্ছে নিত্যলীলা, এখানে কুঞ্জভঙ্গ হল—কুঞ্জভঙ্গ হয়ে আবার সে লীলা চলুক—আবার লীলার অবসান, আবার লীলা চলুক এইরকম ভাবেতে চলতে থাকে।

মূলে দাঁড়াল কি? সমস্ত লীলা, লীলার পরিকর, লীলার ধাম, কল্প বা লীলার জন্য যা কিছু দরকার সমস্ত রাধার থেকে বের হয়ে অর্থাৎ সেই হ্লাদিনী শক্তি থেকে বের হয়ে সেখানে কিনা আনন্দেই লীন হয়ে যায়। কেননা জগতে যতকিছু তৈরী হয়েছে সব অবিদ্যার থেকে। অবিদ্যা অজ্ঞান বলে এখানে যা কিছু হয়, যত বড় দেখি না কেন, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত, তাদের মধ্যেও অবিদ্যা আছে। একটু অবিদ্যা না থাকলে সৃষ্টি হতে পারত না। আমরা এখানে যা কিছু করি তার মধ্যে একটু অবিদ্যার সম্বন্ধ থাকবেই—অবিদ্যার মূলটা কি? না, হ্লাদিনী শক্তি। যেখানে কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, সেই হ্লাদিনী শক্তিরূপ যে অমৃত সেই অমৃতের দ্বারা রচিত। তাই সেটা রাধা ছাড়া হবার উপায় নেই। এইজন্য যখন তিনি গুটিয়ে আসেন মিলনের সময়েতে, ছড়ান আনন্দটা তখন গুটিয়ে যায়। আবার যখন কুঞ্জভঙ্গের পরে খোলেন তখন আবার ক্রমশঃ সেটা ছড়িয়ে যায়। এমনিভাবে নিজেকে পাবার জন্য স্বাধীন রূপেতে এবং আস্বাদনের সর্বভাবে,—একভাবে শুধু নয়—রাধা

যখন কৃষ্ণকে পান তখন নিজেকেই নিজে পাওয়া। নিজেকে নিজে পাওয়ার কত রকমভাবে যে পাওয়ার পন্থা আছে, তার সংখ্যা নেই, কারণ ভাব অনন্ত।

যাকে আমরা ভাবরূপা রতি বলি সেটাই হচ্ছে ভক্তির মূল স্বরূপ। —সাধক যখন নাকি সেই ভাবরূপে প্রবিষ্ট হয় তখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই ভাব সাধনার ফলেতে সেই ভাবটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে প্রেমরূপে পরিণত হয়—তারপর সেই যে প্রেম সেটা আরও পুষ্ট হয়। পুষ্ট হয়ে প্রেমটা হয় তখন রস। রসের পরেতে আর পাট নেই—পাট শেষ হয়ে গেল—তখন ক্রমশঃ নিত্য-অবস্থা লাভ হয়। সাধনার যেটা সাধ্য, যেটা লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটা যখন প্রাপ্তি হয় তখন সেটা হচ্ছে সিদ্ধাবস্থা। সুতরাং সাধকের তিনটি অবস্থা হয় ঃ একটি অবস্থা ভাবের বা ভক্তির প্রারম্ভিক অবস্থা, আর একটি হচ্ছে প্রেমের ভক্তির মধ্যম অবস্থা—আর একটা হচ্ছে রস—সিদ্ধাবস্থা। ভাব অবস্থার যখন নাকি উদয় হয়, হৃদয়েতে ভক্তির উদয় হয়েছে এই যে ভাবাবস্থা, এই ভাবাবস্থার যখন উদয় হয় তখন তার test বা যাচাই কি? তখন তার test হচ্ছে, এই যে নিজের যে স্বরূপটা সেটা তখন আর একরকম হয়ে যায়। আমি এখন যে স্বরূপে আছি এটা হচ্ছে মায়িক স্বরূপ, কিন্তু তখন আমার মধ্যে যে স্বরূপটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে অমায়িক স্বরূপ—চিৎস্বরূপ। নিরাকার নয়, সাকার। এটা সবসময় মনে রাখতে হবে। সুতরাং যখন নাকি আমার ভাবের বিকাশ হয় সেই সময়েতে আমি নিজের ভাবের অনুরূপ নিজের সত্তাটাকে বোধ করতে পারি এবং সেই যে সত্তা সেটাই তখন আমি বলে বোধ হয়।

ভক্তি-সাধনার মধ্যে দুটি জিনিষ দরকার—কি দুটো জিনিষ দরকার? —একটা হচ্ছে ভক্তির যে আশ্রয় তার প্রকাশ। আর একটা হছে ভক্তির যে বিষয় তার প্রকাশ। তারপরে আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর সম্মিলন—এই তিনটে জিনিষ নিয়ে ভক্তি-সাধনা হয়। ভক্তির আশ্রয় কি? না, যে ভজন করবে সে। যেমন, আমি ভজন করব—আমি ভজন করব মানে আমার প্রকাশ আছে। বলা যায় আমার প্রকাশ তো আছেই, কিন্তু এটা তো মায়ার প্রকাশ, এটা তো মায়িক জগতে উৎপন্ন হয়েছে, এটা হচ্ছে মায়ার দেহ, কালের অধীন, এ দেহেতে জরা আছে, মৃত্যু আছে, রোগ আছে, শোক আছে, অনেক কিছু আছে। এ দেহের ভিতরে আর একটা দেহ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে-দেহটার ভিতরে জ্ঞানের প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দেহটা অভিব্যক্ত হয় না, কিন্তু যখন অভিব্যক্ত হয় তখনই তার নাম হচ্ছে ভাবের বিকাশ। ভাব যখন আবির্ভূত হল—ভাব মানেই দেহাত্মক—আমি যেমন উপাসনা করছি—কিসের

উপাসনা করছি ? যেমন, আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আমি বালক গোপালের সখা —সখ্যভাবটা আমি ভালোবাসি—বা আমি শিশু হয়ে মাতৃভাবে উপাসনা করছি তাহলে আমার যে রূপটা প্রকাশ হবে—ভাবের রূপ যেটা, সেটা হবে একটা শিশুর রূপ—তিন বৎসরের হতে পারে, চার বৎসরের হতে পারে, পাঁচ বৎসরের হতে পারে, সেটা হচ্ছে আমার ভাবের যে সত্তা তার অনুরূপ সেটা —সে প্রত্যেকের একরকম হবে না। কিন্তু বালকরূপে প্রকাশ হবে তখন সে রূপটা কে দেখবে ? আমি নিজেই দেখব। আমি কোথায় ! এই দেহে যে চৈতন্য সেই চৈতন্য তখন থাকে না—এই দেহাত্মবোধ থাকে না, তবে দেখে কে ? আমিই দেখব। কে আমি ? নিরাকার চৈতন্য সাক্ষীস্বরূপ। আমি সাক্ষী থাকি, যেটা নাকি গুরুদত্ত। যে রকম গুরুদত্ত যে বীজমন্ত্র, এই বীজ-মন্ত্র সাধনার পরে যখন আমার সিদ্ধাবস্থা হয়েছে, সেই সিদ্ধাবস্থায় আমার ভাবের বিকাশ হয়েছে। সেই অবস্থায় আমার অভাবরূপ সত্তাটার ঢাকা সরে গেছে। সেই সময়েতে আমার যা কিছু আবরণ—অবিদ্যার আবরণ যা কিছু, সেগুলো সব সরে গেছে, সরে গিয়ে আমার মধ্যে যে প্রারব্ধ কর্ম, সে রয়ে গেছে ; তখন আমার ভাবের প্রকাশ হয়েছে। সেই ভাবের প্রকাশ হয়ে সেই ভাবকে নিয়ে আমি নতুন জগতে প্রবেশ করছি। সুতরাং তখন আমি শিশু হয়েই জন্মেছি—এটা আমার দ্বিতীয় জন্ম—একে দ্বিজ বলে—দ্বিতীয় জন্ম, এটা হল second birth. আমি প্রকৃতির গর্ভে মায়ের পেটেতে জন্ম নিয়েছি, বয়স বেড়েছে—সংসারে কাজকর্ম করেছি, তারপরে বৃদ্ধ হয়েছি, এটা হ'ল প্রাকৃতিক জন্মের ব্যাপার। আবার অপ্রাকৃত জন্ম একটা আছে কিনা ! যার জন্য দীক্ষা নিতে হয়—যার জন্য গুরুর কাছে যেতে হয়—যার জন্য মহা-পুরুষের সংশ্রব করতে হয় সেটাও তো একটা জন্ম। জন্ম যদি হয় তাহ'লে দেহপ্রাপ্তি আছে,—বিদেহ নয় সেখানে দেহ আছে—সে দেহটা কার ? আমারই দেহ। এ দেহটা কার ? এটাও আমারই দেহ। এটা আমার প্রাকৃত দেহ আর সেটা আমার অপ্রাকৃত দেহ। প্রাকৃত দেহের সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রাকৃত দেহও জেগে ওঠে। সে দেহ পঞ্চভূতের তৈরী নয়,—সে দেহে রোগ হয় না, শোক হয় না—আর দেহে সবই হয়, সে হলে আমারই তো দেহ, আমাকে ধরেই সেটা থাকে। কাজেই আমি এখানে আছি, অভিমান করছি, এই যে প্রাকৃত দেহযুক্ত যে আমি প্রাকৃত জগৎকে দেখছি। আবার যখন আমার অভিমানটা প্রাকৃত দেহের থেকে অপ্রাকৃত ভাবদেহে আমি নিবিষ্ট করব, তখন এই প্রাকৃত দেহটা আমি আর দেখতে পাব না। যেমন মানুষ ধ্যানস্থ হয়ে গেলে আর বাইরের জিনিষগুলো দেখতে পায় না, কোনদিকে

লক্ষ্য নেই তা'র, তেমনিতর যখন আমি প্রাকৃত দেহের থেকে আলগা হয়ে যাব সেই সময়েতে প্রাকৃত দেহ আমার দৃষ্টিতে পড়বে না। অথচ আমি তখন দৃষ্টিহীন নই, আমার দৃষ্টি আছে সে-দৃষ্টি এ চক্ষুর নয়,—সেটার নামই হ'ল সাক্ষী, দ্রষ্টা—আমার মধ্যে চিদ্‌ভাব—আমি নিরাকারও বটে, সাকারও বটে —নিরাকাররূপ যে সত্তা, আমার আত্মসত্তা, সে যখন দ্রষ্টা থাকে যে কোন কালে ঘুমোয় না, সে দেখে আমার ভাবগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং ভাবদেহে সে প্রবিষ্ট হয় এবং অভিমান করে ভাবদেহের, তখন ভাবদেহকেই মনে করে আমি আমি আমি।

দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের মধ্যেই এমন কেউ আছেন যিনি হয়তো ভগবানের সখী ছিলেন। যদি তাঁর স্মৃতি থাকে তাহ'লে সে বুঝতে পারবে সেটা। কাজেই এই ভাবদেহ যেটা এই ভাবদেহেতেই যখন অভিমান জাগে, সেই ভাবদেহকেই তখন সে আশ্রয় করে আমি রূপ। এ আমি কিন্তু তখন ঘুমিয়ে আছে, এ দেহের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, একটা অভ্যাসমত আছে। আর শিশুর চৈতন্যসত্তা যেটা সে অভিমানকে আশ্রয় করে, আর যে একটা দেহ যেটা গুরুকৃপাতে আমি প্রাপ্ত হয়েছি, যাকে আমি ভাবদেহ বলছি, সেই ভাবদেহকেই তখন সে আশ্রয় করে অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি আমি একটি শিশু —শিশু হয়ে আমি যেন ছট্‌ফট্ করছি—কাঁদছি মা কই, মা কই, মা কই বলে! সে তখন আমার দেহ—আমিই চিন্তা করছি। শিশু যেমন অসহায় একলা পড়ে থাকলে ছট্‌ফট্ করে আশ্রয়ের জন্য এবং সে আশ্রয় মা ছাড়া আর কাউকে তো সে জানে না—ছোট শিশু আর কাকে চেনে? তার তখন জগতের সঙ্গে পরিচয়ই হয়নি—প্রথম পরিচয় তো তার মার সঙ্গে—কাজেই মা বলে সে ডাকে—মা কই, মা কই, মা কই! এই যে অভাব—শিশুর যে প্রাণের ডাক, এই যে একেবারে নিরাশ্রয় অসহায় শিশুর, প্রাণের ডাক—ভাবের সম্বন্ধ এর নাম হচ্ছে ভাবসাধনা। এই অবস্থায় মাকে পাবার জন্য চেষ্টা— এটা ভাবের সাধনা, ভাবদেহেতে সাধনা, যেটা হয় সেই ভাবেতে। সে কি জানে তার কেউ আছে কি না, ছোট শিশু যেমন জানে তার মা ছাড়া আর কেউ নেই।

এই হ'ল আমাদের প্রকৃত সাধনার রূপ। যে যতই সাধনা করুক, যে যতই যোগ অভ্যাস করুক, যতই জ্ঞানের চর্চা করুক, লক্ষকোটি বছর পর্যন্ত সমাধিতে থাকুক, তার দাম এক পয়সাও নয়, যদি ভাব না থাকে। তার জন্যে না কাঁদলে, তাঁর আপন না হতে পারলে—সে আত্মরূপে প্রকাশ হবে কেন? আপন হয়ে প্রকাশ হবার জন্যই দরকার কাঁদা—যে কাঁদে তার কাছে তো সে

আসবে। সব জিনিষেরই একটা দাম দিতে হয়—এই জিনিষটা হচ্ছে ভাবসাধনা। এই ভাবসাধনা যদি আমি না করতে পারি—বাইরের সাধনা যত কিছুই করি না কেন সে সাধনা হচ্ছে কৃত্রিম, hypocritical। তবে তারও দরকার আছে। অভ্যেস করতে করতে হয়তো এসে যেতে পারে একটা জিনিষ, একথা সত্য।

এই যে ভাবসাধনা এতে ধাম প্রকাশ হয়। প্রথমেতে ধাম মানে হচ্ছে একটা রূপ যখন রয়েছে, আমার আমি যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন কোথাও তো রয়েছে। ভাবদেহটাও যখন প্রকাশ হয় সেও তো কোন একটা environmentএর মধ্যে প্রকাশ হয়—সুন্দর বাগান, সুন্দর স্থান, নদী বয়ে যাচ্ছে। পাহাড় দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর দৃশ্য—তবে সে তো শিশু, সে তো জায়গার ঐশ্বর্যেতে মুগ্ধ নয়, সে মার অভাব অনুভব করছে—মা কই! মাকে তো আমি পাচ্ছি না···'যেনাহং নামতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্' উপনিষদ যেমন বলেছেন ঠিক সেরকম। তার মনে হয়, আমি যদি মাকে না পাই তাহ'লে আমার কি হবে?—কাজেই সে ঐশ্বর্যময় ধাম অতি চমৎকার—যদি কখনও কেউ দেখে তাহ'লে সে মুগ্ধ হয়ে যাবে, বৈকুণ্ঠের চেয়েও সুন্দর এত চমৎকার। কিন্তু তবু তা'র ভাল লাগে না সে সব, কেননা তার মা নেই যে, মাতৃহীন সে। মাতৃহীনের পক্ষে কিছুই ভাল লাগা সম্ভব নয়—যে পিপাসু তাকে যদি দুধ দেওয়া যায়, সরবৎ দেওয়া যায়, বহুমূল্য খাদ্যবস্তু দেওয়া যায়, তাতে কি তার তৃপ্তি হবে? তা তার হয় না, কেননা তার জল চাই, জল না হলে তার হবে না। মাতৃহীন শিশুর মা না পাওয়া পর্যন্ত কখনই তৃপ্তি হবে না। আমরা তেমনি অধ্যাত্ম জগতে শিশু—কাজেই অধ্যাত্ম জগতে যতক্ষণ পর্যন্ত মাকে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কান্না থামবে না। যতক্ষন কান্না না থামবে ততক্ষণ ভাবসাধনার শেষ নেই।

এইজন্য ভক্তির যে একটা দিক—কি একটা দিক—আশ্রয়। সে আশ্রয় হ'ল কে? না ভক্ত স্বয়ং। ভক্ত এখানে কে? শিশুরূপী—শিশুরূপী যে ভক্ত অনবরত সে প্রাণের ডাক ডাকছে—এই যে ডাকটা এই হ'ল ভাবসাধনা। এই যে পুনঃ পুনঃ ডাক, এই ডাক ডাকতে ডাকতে হয় কি? ভাবটা পরিপক্ক হয়, ভাবের maturity হয়—maturity হওয়ার লাভ কি?—লাভ এইজন্য যতক্ষণ ভাব পরিপক্ক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ভাবের আস্বাদন করবার মত কেউ থাকবে না। কে আস্বাদন করে সেই ভাবকে?—শিশুর ভাবকে আস্বাদন করবে কে?—আমি যদি শিশু হই এ জগতে, আমার যদি কেউ মা থাকে সেই সেটা আস্বাদন করে। জগতে অনন্ত জীব থাকতে পারে

তা'রা সব বাহ্য। বাইরের তারা কে? কেউ নয়—they are nobody to me।

একমাত্র মা শিশুর পক্ষে—একমাত্র মা ছাড়া কেউ নেই। আমি যদি সখ্য-ভাব নিই আমাকে সেইরূপ ভাব নিয়েই করতে হবে। শিশুর পক্ষে মা ছাড়া তো কেউ নেই। সুতরাং শিশুর যে প্রাণের কান্নাটা সে দরদ দিয়ে দেখবার জন্য একমাত্র মা'ই আছেন। কিন্তু মা তো প্রকাশ হচ্ছে না—কেন প্রকাশ হচ্ছে না?—না, ভাবটা পরিস্ফুট হয়নি—আরও একটু কাঁদুক, নইলে সেই অবস্থাটা আসবে না, কেননা এখনও ভাব ফোটেনি। একটা ফুলের কোরক সেইটাই প্রস্ফুটিত হলে ফুল হয়, আর প্রস্ফুটিত ফুল হলে তাতে গন্ধ হয়। কোরকের মধ্যে গন্ধটা থাকে না। আসলে কিন্তু থাকে—থাকে অব্যক্তভাবে। ঠিক তেমনিতর ভাবের মধ্যে প্রেমটা আছে কিন্তু সেই প্রেমটা পরিস্ফুট নয়, আর প্রেম না হলে গন্ধটা পাওয়া যায় না, আস্বাদন হবে কি করে? এইজন্য ভাবটাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আবর্তন করতে হবে—এই পুনঃ পুনঃ আবর্তন করতে করতে ভাবটা পরিপক্ক হয়ে যায়। যখন ভাবটা পরিপক্ক হয় তখন আর বলতে হয় না ক'দিন পরে মা প্রকাশ হবেন। ভাব পরিপক্ক হলেই বুঝতে হবে যে এবার সে ভাবকে খেলায় যে, সে আসবে অর্থাৎ শিশু তার মা'কে পাবে। শিশু যে অনবরত কাঁদছে মা মা ব'লে, কান্না মা যে শুনতে পাচ্ছে না তা নয় কিন্তু তার প্রত্যক্ষ উপস্থিত হওয়ার সময় এখনও হয়নি, কেননা ভাবের intensity ততটা হয়নি। এইজন্য ভাবসাধনা দরকার। তার সাধনা পূর্ণ হয়ে গেলে তখন হবে কি? জগন্মাতার আবির্ভাব। বাস্তবিকই সে মা জগন্মাতা কিনা তা দেখবার দরকার নেই—শিশু যে সে দেখে আমার মা—নিজের স্বরূপেই দেখে—জগতের মা কি না—জগৎ বলে কিছু আছে কি না—সে সব দেখতে যাবে কেন? আর অন্য সন্তানও থাকতে পারে, সে সব সে দেখবে না। সে দেখবে আমার মা—নিজের মা, তবে না আপন বলে চিনতে পারবে। প্রত্যেকেরই তো মা আছে, সকল মার মূলে যে একই মা আছে সেই মা সকলের মা, সেটা তো জ্ঞানের কথা কিনা—শিশু তো এখনও জ্ঞানী নয়, সে চায় আমার মাকে চাই—আর তো কিছু দরকার নেই। সে তার মাকেই পায়—নিজের মাকে পায় অর্থাৎ এমন মাকে পায় যে-মা তা'কে আপন বলে গ্রহণ করে। সে মা অন্য কোন বিচার করে না—এর দোষ আছে, ত্রুটি আছে। আরে বাবা! যদি হেগে মুতে থাকে তাহ'লে তাকে সাফ করে নাও—তার duty হচ্ছে সেটা—নিজের মা যে সে, সে তো অন্যের মা নয়। কাজেই নিজের মা-কেই সে চায়।

কোন্ সময় সে পাবে? যখন তার ভাবটা প্রেমরূপে পরিণত হবে। কখন প্রেমরূপে পরিণত হবে? সে কি করে বলা যায়—একদিনেও পরিণত হতে পারে—এক ঘণ্টায় হতে পারে, আবার ১৫ দিনও লাগতে পারে। ভাব যতক্ষণ intense না হবে, তীব্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হ'বে না। এমন অভাববোধ যে তীব্রতা হলে এক মুহূর্তেও হতে পারে। সুতরাং কোনো সময় নির্ধারণ করা যায় না। বলে না আমাদের যোগশাস্ত্রেতে, সংবেগ যদি তীব্র হয় তাহ'লে অতি শীঘ্রই সিদ্ধ অবস্থা এসে পড়ে। এই সংবেগ মানে ব্যাকুলতা —সুতরাং সেই ভাবের সংবেগ যদি তীব্র হয়ে যায়, intensity যদি তীব্র হয়, তাহ'লে there is no question of time—যেটা ১০ বছরে হওয়ার কথা, সেটা ১০ সেকেণ্ডেও হতে পারে—একটা ক্ষণে সমস্ত বিশ্বকে পাওয়া যেতে পারে —সবই সম্ভবপর সেটা। কাজেই যত তীব্র হবে ততই বুঝতে হবে নিকট-বর্তী জিনিষটা। অভাবটা যত তীব্র হবে—অভাবের বোধটা যত তীব্র হবে —বিরহ ভাবটা যত তীব্র হবে—তাহ'লে মিলন সন্নিকটবর্তী। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, আর যদি পিপাসা হয় তাহ'লে জল পাবেই পাবে—কাজেই একটা দিক তীব্র হলে আর একটা দিক তীব্র হতে বাধ্য। যখন ভাবটা সংবেগপ্রাপ্ত হয় তখন ভাবটা প্রেমরূপে প্রকাশ পায়। যেমন বলা হয়, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা' একথাটাই তখন আসে এবং বাস্তবিক পক্ষে মা মহাপ্রকাশ হন। তখন কার মা? শিশুর মা। কোন শিশু? যে ভাবসাধনা করছে, যে কাঁদছে মা মা বলে—অন্যের কাছে না হতে পারে, তার কাছে হবেই হবে। এই হলে বোঝা গেল ভাবসাধনার অবসান—ভাবসাধনা শেষ হল।

যে-রাজ্যে সেই ভাবুক রয়েছে, যে ভাবের আস্বাদন করছে সেই রাজ্যটা হচ্ছে ভাবরাজ্য—সেটা material world নয় অর্থাৎ জড়জগৎ নয়, যেটা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—এ দিয়ে তৈরী হয়, সেটা নয়—,এটা ভাবের রাজ্য—ভাব দিয়ে তৈরী—অথচ সব জিনিষই আছে কিন্তু উপাদান যেটা সেটা পাঞ্চ-ভৌতিক সত্তা নয়। এটা তো ধারণা করা কঠিন নয়। বায়স্কোপে যেমন আমরা আগুন দেখি, জল দেখি, পাহাড়-পর্বত দেখি, মানুষ দেখি, সবই দেখি কিন্তু মূলে it is nothing but light, সেটা আলো ছাড়া কিছুই নয় অথচ দেখতে সবই পাওয়া যায়। এখানে যেটা দেখছি মূলে সেটা আলো ছাড়া কিছুই নয়—এটা এক স্তরের আলো, সেটা অন্য স্তরের আলো। সেটা আবার চিন্ময় জগতে বৈকুণ্ঠাদিতে যখন নাকি দেখা যায় সেখানেও তো একটা আলোই, তবে এই আলো নয়—দিব্য আলো, আলো ছাড়া কিছুই নয়। অথচ অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে স্ফুরণ হয় সেখানে—ভক্ত এটা পায়, জ্ঞানী এটা পায় না।

জ্ঞানীরা খণ্ড জ্যোতিটা পায়। ওটা পেতে পারে না। ভক্তি ছাড়া ওটার স্ফুরণ হতে পারে না। মা প্রকট হলেন। মা যে প্রকট হলেন (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শিশুর ভাব নিয়ে বলছি) মা প্রকট হয়েই প্রথম কি কাজ করলেন? শিশুকে দেখে কত ছটফট করে যেন কতকাল পরে তাকে পেয়েছেন তাকে কোলে নেবেন—কোলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যত বিরহ যত গ্লানি সব দূর হয়ে যায়, তখন একেবারে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়—মা'কে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন জিনিষের দরকার হয় না—সেটাই তো সে চায়—অন্য জিনিষ তো সে চায় না—ধন ঐশ্বর্য কোন কিছু তার দরকার নেই, সে শুধু মাকেই চায়, মাকে সে পেয়ে গেল—পর্ব শেষ হয়ে গেল। বলে না, তা শেষ হয় না—এর পরেও আছে; কি আছে তখন? তখন হয় প্রেমসাধনা। এর পরের যে সাধনা সেটা হ'ল প্রেমসাধনা অর্থাৎ এই যে মাকে পেল ভাবসাধনার ফলেতে। তারপরে এই প্রেমেরও একটা পরিপক্কতা আসে। যে প্রেম তাতে ফুটে উঠেছে, যে প্রেমের প্রভাবেতে মাতৃভাবের প্রকাশ হয়েছে সে প্রেমটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ পরিপক্ক হয়। যতই প্রেম গাঢ় হতে থাকে ততই ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই ভাবরূপ এবং যে প্রেমেতে এই দুই দিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ গলতে থাকবে—যাতে গলিয়ে দেয়—মাকেও গলিয়ে দেয় ভাবুককেও গলিয়ে দেয়—ভক্তকেও গলিয়ে দেয়—গলতে গলতে রসে পরিণত হয়—তখন কি? সেই যে ভজন করছিল বালক বা শিশু আর তখন শিশুর প্রশ্ন নেই। আগে মা ছিলেন তারও প্রশ্ন নেই। এখন তো শিশু জীব নয়, মা ভগবান নন্। শিশু আর মা ক্রমশঃ ক্রমশঃ গলে গিয়ে—এই যেমন দুটো সোনার আংটি আগুনের মধ্য দিয়ে যদি গলিয়ে নেওয়া যায়—তখন দুটো মিশে গিয়ে একটা তরল পদার্থ হয়ে গেল, তেমনিতর মা ও শিশু দুইয়ে মিলে একটা জিনিষ হয়। কি জিনিষ? সেটাই হচ্ছে রস—রসে পরিণত হয়ে গেল। এই যে রসটা হল এর মধ্যে আর শিশু নেই, যাকে ভক্ত বলতাম, ভাবসাধনার দ্বারা, সে নেই আর মাও নেই অর্থাৎ সেখানে সাধকও নেই ইষ্টদেবতাও নেই—সাধক ও ইষ্টদেবতা দুইয়ে মিলে একটা জিনিষ হয়ে গেছে—এটা হচ্ছে একটা অদ্বৈত অবস্থা—এটা হচ্ছে রসাদ্বৈত। এই যে রস জিনিষটা হ'ল এটা হচ্ছে তরল জিনিষ। এই রস দিয়ে যখন তার সিদ্ধাবস্থা এসে গেলে তখন তার অচিন্ত্য একটা রূপে প্রকাশ হয়। যে রূপ প্রকাশ হয় সেইরূপে তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রেমের বিকাশের ফলে রূপের উদয় হয়ে সেই নিত্যসিদ্ধ রসময় তনু না করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিত্যলীলায় প্রবেশের অধিকার নেই। সুতরাং নিত্যলীলায় যে কোন লোক যেতে পারে, তা নয়। যেতে

পারে না। সেই নিত্যলীলার idea যখন ভিন্ন। ভগবানের এটা হচ্ছে মহা-কৃপা যে এই প্রপঞ্চের ভিতরেতে এমন সব স্থান করেছেন যেখানে এসে জাগতিক লীলা করেছেন এবং জাগতিক লীলাকে নিত্যলীলার স্বাদ দিয়ে গেছেন। তাতে লোক বুঝতে পারবে, রস পাবে, তারপরে সেই আকাঙ্খা হলে, যোগ্যতা বাড়লে নিত্যলীলায় প্রবেশ করতে পারবে।

এখন কথা হচ্ছে, এই এটা হ'ল সাধনক্রমের ধারা ঃ সাধনা প্রথমে অভাবরূপেতে থাকবে, তারপর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে তখন গুরু আসেন। তখন গুরু আমার ভিতরেতে যা কিছু অবিদ্যার খেলা জানেন, বোঝেন, তারপরে বীজমন্ত্র দান করেন, তারপর সেই মন্ত্র সাধনা করতে করতে আমার মধ্যে অজ্ঞানের যা কিছু সে সমস্ত ক্রমশঃ ক্রমশঃ দগ্ধ হয়ে যায়—, দগ্ধ হয়ে গেলে আমার যে অভাবময় সত্তা, মলিন সত্তা, সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

সেটা গিয়ে শুদ্ধসত্তা প্রকাশ হয়। শুদ্ধসত্তা প্রকাশ হ'লে তখন ভাবের প্রকাশ হয়—ভাব মানে স্বভাব। নিজভাবে সেই ভাবের প্রকাশ হয়। তারপর ভাবসাধনা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমসাধনা সম্পূর্ণ না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত হলো দ্বিতীয় স্তর। প্রেমের সাধনার দুটো স্তর। একটা স্তরেতে ভক্ত তার নিজের যে eternal স্বরূপ সেই স্বরূপে প্রকাশ হয়। তারপরেতে ভক্তের যে ইষ্ট সেও তার eternal স্বরূপে প্রকাশ হয়। এই দুটো স্বরূপের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ আছে। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে অর্থাৎ সাধকের সঙ্গে এবং তাঁর ইষ্টের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। তারপরে যখন দুটো গলে গিয়ে মিলন হয়, যখন প্রকৃত দুটো existence মিলে এক existenceএ পরিণত হয়ে যায়, দুটো আলাদা সত্তাই থাকে না—সেটাই হলো রস। সেটা হলে ভক্তই বা কোথায় সাধকরূপেতে, বা ভগবান বা ইষ্টই বা কোথায় সাধ্যরূপেতে? একটি জিনিষ যে, সাধ্য সেও যে, সাধক সেও তা—তুমি আমি এক, অভেদ, এক জিনিষ হয়ে গেলো। সেটাই হলো রস—দ্বিতীয়র তো স্থান নেই। সেটা থেকে যে কোন খেলা চলুক না কেন—অদ্বৈতের খেলা সেটা—আমি তুমি হলে খেলি শতশত তুমি হয়ে, খেলি যে তুমি সে তো আমি'ই—দ্বিতীয় কিছু নেই খেলবার জন্য হয়ে যাচ্ছি কিনা।

এগুলো বুঝতে পারলে মায়ের অনেক কথাই বুঝতে পারবে—শুনতে মনে হয় খুব ভালো philosophyর কথা কিন্তু মূলে একটা তত্ত্ব আছে তো, এটাই হ'ল একটা দিক। আমি তো একটা সামান্য দিক দিয়ে বললাম, একজন ভক্ত একজন ইষ্ট এই নিয়ে কথাগুলো বললাম। কিন্তু মূলে জিনিষটায় যদি যাওয়া যায় তখন দেখা যাবে যতরকমের ভক্ত আছেন, ভক্তি আছে তার একটা

মূল আছে, যত রকমের ভক্তি আছে—আমাদের এরা মোটামুটি চার রকমের পাঁচ রকমের রয়েছেন তার অবান্তর ভেদেতে আরও ৫।৬ রকমের আছে যতই থাক—মোটামুটি এই পাঁচ রকমের, কি না, কেউ শান্তভাবেতে ভজন করেন, কেউ দাসভাবে ভজন করেন। কেউ হয়তো সখ্যভাবে ভজন করেন, কেউ হয়তো বাৎসল্যভাবে ভজন করেন, কেউ হয়তো মধুরভাবে ভজন করেন—এইসব ভিন্ন রকমের আছে এবং প্রত্যেক ভাবেতেই একটা ভক্তের দিক আছে আর একটা ইষ্টের দিক আছে। যাঁকে ভজন করবে তাঁর একটা দিক আছে। এখানে ভক্ত অনেক রকমের পাওয়া যাচ্ছে ঃ শান্ত ভক্ত, শান্ত ভাবে করছেন, যেমন সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার—এঁরা নারায়ণকে পরব্রহ্মলোকেতে ভজন করছেন শান্তভাবেতে ধ্যানস্থ হয়ে। প্রেমভাবেতে তাঁকে অনবরত দেখছেন—এ একটা জিনিষ—এর মধ্যে লীলা নেই। আবার লীলার ভিতর চারটে ভাব আছে—প্রথমটাই হচ্ছে দাস্য, তারপরে সখ্য, তারপরে বাৎসল্য, তার পরে মাধুর্য। এই দাস্যভাবের ভিতরেতে দাস ভাব আছে—আমি দাস তুমি প্রভু, এটাও একটা অবস্থা। এ এক রকমের ভক্ত। আবার আর এক রকমের ভক্ত আছে—না, তুমি আমার সখা। এই সখ্যভাব কত কোটি কোটি রকমের আছে। সখ্যভাব সকলের সমান নয়—আমার দশজন বন্ধু আছে—প্রত্যেকের সঙ্গে আমার পৃথক্ পৃথক্ relation সম্বন্ধ। ভাবের সম্বন্ধ দিয়ে অন্যরকমের, এই রকমের আছে। আস্বাদনের জন্য তো ! যেমন শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে আমরা পাই ভিন্ন ভিন্ন তাঁর সখা ছিলেন—শ্রীদাম একজন সখা, বসুদাম একজন সখা, মধুমঙ্গল একজন সখা, সুবল একজন সখা—প্রত্যেকের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক ছিল সখ্য, কিন্তু একরকমের সখ্য নয়—আস্বাদন একরকমের নয়। কেননা সকলের সঙ্গে একরকমের ভাব হতে পারে না কখনও। তেমনি আবার আছে বাৎসল্য —আমি যদি পিতা হই তিনি পুত্র হন, তাহ'লে সেটা হ'ল একটা বাৎসল্য-ভাব। আমি যদি মা হই, তিনি যদি সন্তান হ'ন,—যেমন যশোদার ভাব ছিল, —সে হ'ল এক রকমের ভাব। আমি যদি মাসী হই, আমি যদি পিসী হই, আমি যদি মামী হই, আমি যদি মামা হই—বড় সম্পর্ক যত রকমের হতে পারে ভগবানের পক্ষে সবই সম্পর্ক মানুষ লাগিয়ে দিতে পারে এবং সেইভাবে তার প্রাপ্তি হতে পারে—সেগুলো সবই তো বাৎসল্য। শিশুকে মা যেমন বাৎসল্য ভাবে দেখেন তেমনি তো মাসীও দেখেন, পিসীও দেখেন, সকলেই দেখেন, সেই রকম ভাবে সবই হতে পারে। এগুলো আমাদের বৈষ্ণব আচার্যরা ভালো করে দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা বলে একখানা গ্রন্থ আছে আর গৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্তরা গৌড়গণোদ্দেশদীপিকা বলে একখানা বই লিখেছেন—

শ্রীকবিকর্ণপুর সেটা লিখেছেন—এ হ'ল একটা দিক—ভগবৎ-পরিবার বা ভক্ত-পরিবার নিত্য-পরিবার। এরকম একটা দিক আছে। তেমনি কান্তভাব, মধুরভাব যে কতরকমের হতে পারে—কাজেই ভক্তও কত রকমের হতে পারে। কিন্তু মূলে ভক্ত কি এত রকমের! না, সবজগতের যেমন অনন্ত বৈচিত্র্যময় দিক দেখা যায় কিন্তু মূলে তো একটাই জিনিষ, সেই একটা জিনিষের থেকেই কত জিনিষ বেরিয়ে আসে,—তেমনি মূলে যে ভক্তি যেটা, সেটা একটাই—সেই একই ভক্তি আধারভেদেতে, পাত্রভেদেতে, অবস্থাভেদেতে নানারকম রঙ ধারণ করে, রূপ ধারণ করে—ভিন্ন ভিন্ন তখন হয়ে যায়। মূল একটা—সেই মূল ভক্তিটা চাই—সেই মূল ভক্তি কই? সেই মূল ভক্তি দরকার। সেই যে মূল ভক্তিটি এ'রা বলেছেন, তিনিই হচ্ছেন ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ—কে সে? তার নামই হচ্ছে রাধা। অতএব যত রকমের ভক্ত আছে বা হতে পারে অনন্ত কোটির অনন্ত সবই হচ্ছে রাধার কায়ব্যূহ—তার থেকেই বেরিয়েছে, কেননা তাতেই যে লয় হয়ে যায় কিনা! যিনি যেরকম ভাবেই ভক্তি করুন না কেন, ভালবাসুন না কেন, কিন্তু ভালবাসার যেটা নাকি প্রকৃত রূপ, যেটা পূর্ণ রূপ সেটাই শ্রীরাধাতত্ত্ব। কাজেই রাধাকে না বুঝলে প্রকৃত প্রেমতত্ত্ব বোঝা হয় না।

রাধাকে বুঝতে হলে কি করে বুঝতে হবে তার কতকটা আভাস দিই। যত রকমের ভক্তিই থাক না কেন, সেই ভক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। সেই স্তরের মধ্যেও কতকগুলো জিনিষ আলোচ্য আছে। সেই জিনিষটা হচ্ছে এই ইচ্ছা। যে ইচ্ছা নিয়ে জগতে আমরা খেলা করি, আর যে ইচ্ছা নিয়ে ভগবান আমাদের সঙ্গে লীলা করেন বা লীলাতে পরিণত হন, এই দুটো ইচ্ছার সংঘর্ষ হতে পারে অথবা সংঘর্ষ যাতে না হয় সেরকম ব্যবস্থাও হতে পারে। একটা জায়গাতে নিজের ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর একটা জায়গায় হচ্ছে নিজের ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বটে কিন্তু তত প্রধান নয়, প্রধান হচ্ছে তার নিজের একটা নীতিমার্গ যে সেটা অনুসরণ করা। আর একটা হচ্ছে নীতিমার্গের অনুসরণও নয়। আর নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রাধান্য আনন্দের আস্বাদনের প্রাধান্যভুক্ত নয়, কিন্তু প্রাধান্য হচ্ছে কি? না, যাকে আমি ভালবাসি, যে আমার ইষ্ট, তার ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা রয়েছে, এখানে তিনি ইচ্ছাহীন নন্। ইচ্ছাহীন হ'লে তিনি ব্রহ্মতত্ত্বে চলে যাবেন, সেটা এদিকের মধ্যে আসবেই না। ইচ্ছাহীন হয়ে লীলা হয় না কখনও। তাঁর ইচ্ছা অর্থাৎ তিনি যেরকম ইচ্ছা করেন। কাজেই রাধাতত্ত্ব বুঝতে হলে বুঝতে হবে ঐ রকমের যে রতি বা ভাব, যে-রতিতে নিজের ইচ্ছার প্রাধান্য নেই—যে-রতিতে কর্তব্য-অকর্তব্যের, ধর্মাধর্মের বিচার নেই—কেবলমাত্র

নিজের ইষ্টের যে ইচ্ছা সেইটাকে অনুকূল-প্রতিকূলের বিচার না ক'রে তাকে পালন করবার জন্য আন্তরিক যে আকাঙ্খা সেটা যেখানে রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে সমর্থভাব। এই যে সমর্থভাব এই সমর্থভাব ধরেই যদি সাধনায় যাওয়া যায় তা' হ'লে প্রকৃত ভক্তির যে পরম স্বরূপ, সেই স্বরূপটা লাভ করা যেতে পারে।

এই ভাবেতে যেতে যেতে তখন কি রকমভাবে হবে ?—সাধনায় ক্রম ধরে একটা যাবার রাস্তা আছে আর সাধনায় ক্রম না ধরে, যুগপৎ একটা জিনিষ পাওয়ারও অর্থ আছে—এই দুটো পথ রয়েছে। যারা ক্রম ধরে যায়, তাদের হচ্ছে কি ? না, সমস্ত পরিক্রমা করে যেতে হয়—একটা, তারপর একটা, তারপর একটা প্রভৃতি। কেননা মহাভাব রয়েছে মধ্যে—প্রথমে হচ্ছে দাস্যভাব—দাস্যভাবের পরে সখ্যভাব, সখ্যভাবের পরে বাৎসল্যভাব, তারপরে মধুরভাব হয়ে centreএ মহাভাবে গিয়ে পৌঁছানো। যেমন মানুষ ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাল্য বা কৈশোর বা যৌবন বা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে বার্ধক্য অবস্থা লাভ করে—পরপর এরকম অবস্থা হতে পারে। এই একটা দিক পরপর। আর একটা জিনিষ আছে, যার ভিতরে যে ভাবের সৃষ্টি অধিক, অভিব্যক্তি অধিক, সে সোজাভাবেতে একেবারেতে সেই মহাভাবেতে প্রবেশ করতে পারে, সে একটা জিনিষের রাস্তা আছে। কুঞ্জতত্ত্ব বোঝাতে গেলে দরকার হবে সেটা। বলে না, যতগুলো কুঞ্জ আছে ভগবানের ততগুলো ভাব। নিকুঞ্জ রয়েছে centreএ, তাকে ঘিরে অসংখ্য কুঞ্জ আছে। এখন ৩৬০ কুঞ্জ বলে, শুধু বোঝবার জন্য কিন্তু কুঞ্জ আছে অসংখ্য। যতগুলো কুঞ্জ ততগুলো ভাব—এক একটা ভাবের এক একটা কুঞ্জ—যে ভাবে তাকে আস্বাদন করব, ঠিক সেই কুঞ্জে আমি আছি—মধুর ভাবের আস্বাদন হচ্ছে, ঠিক সেই কুঞ্জে আমি আছি। এই যে কুঞ্জগুলি, প্রত্যেকটি কুঞ্জ, যে কোন কুঞ্জ হোক না কেন, তার সঙ্গে মহাভাবের যে মিলিত স্থান তার সঙ্গে যোগ রয়েছে অর্থাৎ যে কোন কুঞ্জের থেকে centreএ যাওয়া যায় সোজা। যেমন যদি একটা circle থাকে তাহ'লে যে কোন কিছু থেকে centreএর বিন্দুতে অর্থাৎ মধ্যবিন্দুতে যাওয়া যায়। এ যেমন আছে আবার সেই জায়গার থেকে পরিধি পরিক্রম করে সেই জায়গায় যাওয়া যায়। দুই-ই হয়। এই দুইয়ের পার্থক্য হচ্ছে এই, একটা ভাব, একটা ভাবের পরে আর একটা ভাব, সেই ভাবটা পূর্ণ হতে হতে আর একটা ভাব নিয়ে এলো, সেই ভাবটা পূর্ণ হতে হতে আর একটা ভাব এলো। এইরকম সবগুলো ভাব যখন পূর্ণ হয়ে গেলো তখন পরিক্রমার দরকার নেই, তখন ভাব ভাবেতে আকৃষ্ট হয়ে মহাভাবেতে চলে গেল—এই একটা দিক রয়েছে—এটার

পরিক্রমা করতে হয়। আর একটা দিক আছে যার যে ভাব আছে তার একটা counterpart রয়েছে মহাভাবের মধ্যে, সেখানে পরিক্রমা করার দরকার নেই —এটা হ'ল ব্যক্তিগত রুচির উপরেতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে এখানে। কাজেই যে যেখানে থাক না কেন ক, খ, গ, ঘ এরকম ভাবগুলো যেমন আছে—ক থেকেও মহাভাবে যেতে পারি, খ থেকেও যেতে পারি, গ থেকেও যেতে পারি —ক থেকেই যে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই—সব জায়গা থেকেই মহাভাবে যাওয়া যায়—যে যেখানেই থাক্ না কেন তারই তো প্রতিমূর্তি ভগবানের মধ্যে রয়েছে কিনা। মহাভাব সর্বভাবের সমষ্টি কিনা, কাজেই যেখানেই থাকুক সেখান থেকেই তাঁকে পেতে পারে। আর একটা অবস্থা পেরিয়ে সেখানে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন সাধকদের নিয়ম আছে না, একটা ক্রম ধরে যায়—ক্রম ধরে গেলে কি হয়—তারপর এইটা, তারপর এইটা করতে করতে তার লাইনটা শেষ হয়ে যায়, সেখানে তার লক্ষ্যবস্তুটা ফুটে ওঠে তার ভাব অনুসারেতে। আর যে যেখানে আছে কোনখানে যাবারই দরকার নেই, সেখানেই সে মহাভাবের প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, পূর্ণ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যে যেখানেই থাক্ না কেন, সেখান থেকে যদি সে নিজেকে বিসর্জন করতে পারে, আত্মবিসর্জন যদি করতে পারে, তাহ'লে সেখানে মহাভাব ফুটে ওঠে। ফুটে উঠে সেখানেই সে পূর্ণ জিনিষ পেয়ে গেল সে, তার পরিক্রমার কোন দরকার নেই। প্রত্যেকটি জিনিষই পূর্ণ কিনা —কিন্তু পেতে যদি না পারে তবে পরিক্রমা করতে হয়, আর যদি সে পরিক্রমা করতে না চায় সেটা সে পেতে পারে। যেমন ধরো যশোদা—যশোদার বাৎসল্যভাব ছিল কিন্তু বাৎসল্যভাবের চেয়ে উঁচুভাব হচ্ছে মধুরভাব—তাই বলে যশোদাকে আস্বাদন করতে হলে সেই মধুরভাবে যেতে হবে না, এই হচ্ছে আমার কথা।

এইরকম প্রত্যেক ভাবের মধ্যে আছে, সখ্য ভাব আছে এবং সেই সখ্যভাবের থেকে যদি মহাভাবের আস্বাদন করতে চায় তাহ'লে সখারূপে তা করতে পারে। কিন্তু ভগবানকে পেতে হলে সখ্যের পরে, বাৎসল্যের পরে, মধুরভাব করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যে যেখানে আছে সেখান থেকে তাঁকে পেতে পারে। ভগবান এমন একটি বস্তু—যে যেখানে আছে যেদিকে মুখ করে আছে, যেরকমে আছে, সে সেরকমেই তাকে পেতে পারে। এমন কোন জিনিষ নেই তা না করলে তাকে পাওয়া যাবে না—তা নয়। অথচ তা সত্ত্বেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে কোন জিনিষের অভাব আছে, সেইটা নেই, এ জন্য আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু এখানে গেলে তাকে পাব—মক্কায় গেলে তাকে

পাব, মদিনায় গেলে তাকে পাব বা জেরুজালেমে গেলে পাব এমন কোন কথা নেই। যে যেখানে আছে সেখান থেকেই পেতে পারে, যদি পাবায় যোগ্য সে হয় সে পেতে পারে।

আর একটা দিক আছে—জীব যখন যায় এখান থেকে, কেননা ওটা হচ্ছে স্বরূপশক্তির খেলা কিনা—জীব যখন এখান থেকে যায় তখন তার যদি আকাংখা হয় সব আস্বাদন আমার চাই। এমন লোক তো আছে, যেমন আমি যখন শিবের কাছে যাচ্ছি প্রণাম করছি—ভাল লাগছে বা শিব কি সুন্দর! গোবিন্দ যখন দর্শন করছি সেটাও ভাল লাগছে। অযোধ্যায় যাচ্ছি, হনুমানের মন্দিরে হনুমানকে দেখছি এবং মনে হচ্ছে হনুমানের কি সুন্দর ভক্তভাব! ভাল লাগছে, এমনও তো আছে মানুষের মন। তাদের পক্ষে যদি পূর্ণ আস্বাদন পেতে হয়ে তখন তাদের common করে দিয়ে তাদের পেতে হয়। কারণ এটাও ভাল, ওটাও ভাল লাগে তো! যেটা ভাল লাগে সেটাই তার পাওয়ার অধিকার আছে; অতএব সকলই যদি ভাল লাগে তাহ'লে পরিক্রমার রাস্তাটা রয়েছে, পরিক্রমা তাকে করতে হবে এবং মহাভাবের মধ্যে সমস্তগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ পরিপক্ক হয়ে গিয়ে এক মহাভাবেতে পরিণত হয়ে যায়। আর একটা পেতে পারে কখন? যে যে ভাবে আছে, কোন জায়গায় যেতে হবে না, সে সেখানেই বড় জিনিষটা পাবে, মহাভাবকে পাবে। মহাভাবকে পেলে তারপরে পরিক্রমারও মূল্য নেই। তখন সরল মার্গ ধরে সেখানে যাওয়া—তারও কোন মূল্য নেই। তখন সব জিনিষটাই সে পেয়ে গেল যে। শ্রীরাধার মধ্যে সবগুলিই আছে—যে যেভাবে আস্বাদন করুক সেখানে গিয়ে দেখা যায় সমস্ত আস্বাদন তারই মধ্য দিয়ে satisfied হচ্ছে—তার মধ্যে কোন আস্বাদনের অভাব নেই। যে ভাবে চাও—পিতারূপে আস্বাদন সেও সেখানে আছে, আবার সন্তানরূপে আস্বাদন সেও সেখানেতে আছে। এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ভগবানের সবরকমের আস্বাদন পাওয়া যায়। সেটা পূর্ণ কিন্তু যাবার পথের মধ্যে ক্রম রয়েছে—অক্রমও আছে—পরিক্রমাও আছে, সরল পথও আছে। সবগুলিই আছে। সেখানে গেলে আর সে ভাব থাকে না। তারপরে রাধাভাব পর্যন্ত যখন যাওয়া যায়—যেয়ে তখন কি হয়? না, পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দেয়। পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়ে গেলে তখন আর ভাব থাকে না, মহাভাব যে সে-ও তখন থাকে না। সেটা হল নিকুঞ্জলীলার প্রারম্ভিক অবস্থা। নিকুঞ্জলীলায় আর কিছুই নেই অথচ এমন একটা বিরাট জিনিষ আছে, সেখানে রাধাও যেন নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারেন না—নিজে নিজেই থাকেন না সেটা—নিজেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন সব—নিজেকে রাখতে পারেন না

—self contentment থাকে না সেখানে—হতে হতে রাধাই যদি না থাকেন কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বও তখন থাকে না। অথচ থাকে সব জিনিষ কিন্তু স্ফুরণটা থাকে না। সেটার নাম হচ্ছে—অষ্টকালীন লীলা আছে না—তারই অন্তিম লীলা হচ্ছে সেটা—মহানিশায়—মহারাত্রিতে রাত্রি ১২টার সময় সেটা হয়। তখন কে আছে সেখানেতে? একটি ক্ষণ মাত্র থাকে—সেখানেতে কাল থাকে না তো—কালের অস্তিত্ব নেই আর সব লীলাতেও কাল নেই—কালের পরিবার একটা নিত্যত্ব, একটা কাল আছে তা না হ'লে নিত্যলীলা হয় কি করে?—কালের বাইরের একটা স্ফুরণ আছে কিন্তু যে কালেতে পরিক্রমা হয় সেখানে—নিত্যলীলার কোনখানেই নেই,—শুদ্ধ কাল যে সেটাও নেই—থাকে শুদ্ধ ক্ষণ—মহাক্ষণ সেটা—সেখানে রাধাও নেই—সেখানে কৃষ্ণও নেই—সেখানে কিছুই নেই—থাকে একটা রস—নিজেকে নিজে আস্বাদন করছে সে—সে যে কি আস্বাদন বোঝবার উপায় নেই। মাধুর্যের আস্বাদন যেটা তারও একটা লীলা আছে। সেখানে তাও নেই। সব আস্বাদন সেখানে আছে—আস্বাদনস্বরূপই সে রস। এই যে রস স্বয়ংপ্রকাশ—প্রকাশ কিনা নিজেকে নিজে আস্বাদন করে—কতদিন সেটা করে?—অনবরত সর্বদাই সেটা করছে—সর্বদাই সে করছে, সর্বদা করার মধ্যেই তার একটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ রসের যে ঘনীভূতভাব—আস্বাদনের যে একটা উৎকর্ষ এটা ক্রমশঃ হয়ে যাচ্ছে—নিরন্তর পরপর শ্রেষ্ঠ আস্বাদন—তারপরে শ্রেষ্ঠ আস্বাদন হয়—কেন হয়? কেননা তারপরে তো স্বাতন্ত্র্য ঘটে না। এইজন্য কুঞ্জলীলার পরে আর কিছুই নেই—ঐ মহাক্ষণের মধ্যে গিয়ে সব হয়ে গেল, রাধাও নেই, কৃষ্ণও নেই। লৌকিক ভাষায় আমরা বলতে পারি দুজনেই যেন ঘুমিয়ে পড়লেন—তাদের আবার ঘুমটি, অপ্রাকৃত ঘুম, যেই ভাঙ্গে, যে লীলাতে ঐ ব্যাপারটি হয়েছে তখন সেই লীলার আবার স্ফুরণ হয়—তখন সেই মাধুর্যের খেলা—সেই নানা রসের খেলা সমস্ত সেখানে প্রকাশ হতে থাকে। এই যে সব প্রকাশ হয়, তারপর অষ্টকালীন লীলা আবার শেষ হয়ে গেল, আবার সেই বিন্দুতে স্থিতি হবে, তখন সেই রসাস্বাদন—সেই রস যে, সে একই রস, একই বিন্দু এবং তার বেশী হয় না, কমও হয় না অথচ সেই একের মধ্যে থেকেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরও বেশী, আরও বেশী আকাঙ্খা হয়—শুনতে পরস্পরবিরুদ্ধ মনে হয় অথচ সে জিনিষটা হয়। এটার নামই সেদিন বলেছিলাম journey within God—ভগবানের ভিতরে প্রবেশ করলেই শেষ হয় না। সাধারণ লোক মনে করে যে ভগবানকে পেলেই সব শেষ হয়ে যায়—কিসে ভগবানকে পেলে সব শেষ হয়ে যায়? ভগবানকে পেলে সত্যিকারের প্রকৃত ভিতরের খেলা আরম্ভ

হয়—যখন তাঁকে না পায় সে তো বাইরের ব্যাপার তাঁতে ঢোকবার জন্য। তাঁতে ঢুকলে আসল জিনিষ আরম্ভ হবে, তাঁতে ঢুকলামই না, এখন তার ভিতরে যে কত কি আছে তা আমি কি করে বলব ? মায়ার আবরণ বাইরে রয়েছে, সে নানা প্রকারেতে, নানা কৌশলে সেটাকে ভেদ করে একবার যদি তাতে ঢুকতে পারি তখন অনন্ত আস্বাদনের পথ খুলে যাবে। মধুর রসের সাধক যাঁরা, ভক্তরসিক সব, তাঁদের নিত্য মিলন, ভগবানের মধ্যে লীলা। কেননা আকুঞ্চণ-প্রসারণ দুটোই আছে এর মধ্যে। আকুঞ্চন কখন হয় ? যখন নাকি অষ্টকালীন লীলা সংবরণ হয়। সংবরণ হ'লেই তখন লীলার ধামও থাকে না, নিকুঞ্জও থাকে না, সে সখীও থাকে না, সখাও থাকে না, সে পিতামাতাও থাকে না, সে গোষ্ঠও থাকে না, সে স্থানও থাকে না, কিছুই থাকে না, অথচ থাকে সব জিনিষ। এক হয়ে একটা বিন্দু মাত্র একটা point—আবার যখন ছড়িয়ে যায়, expand করে যখন, তখন সমস্ত খুলে যায়। এত বিরাট বিশাল যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড একটি কণার মধ্যে, তাও ছোট—এত বিরাট সেটা, যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বিন্দু মাত্র, একটি mere dot। তাঁর পক্ষে এত বিরাট সে স্থান এতটা প্রসারণ তার হয় ; আবার সংকোচ হতে হতে এমন হয় যে কিছুই নেই যেন, একটা বিন্দু আছে—এই হচ্ছে রস-ব্রহ্মের সাধনা।

কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের ক্রম

প্রশ্ন ঃ—কুণ্ডলিনী এবং বিন্দু দুইই আলোচনা প্রসঙ্গে আপনার নিকট শুনিতে পাই অথচ এই দুইটি বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা নাই। আপনি একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

উত্তর—কুণ্ডলিনী শক্তি—ইহার নামান্তর বিন্দু। ইহাকে চিদাকাশ বলে। ইহা পরমেশ্বরের মহামায়ারূপী শক্তি। পরমেশ্বর অথবা পরম শিব চিৎ-স্বরূপ। ইঁহার দুইপ্রকার শক্তি আছে ঃ এক, চিদ্‌রূপী এবং দুই অচিদ্‌-রূপী। চিদ্‌রূপী শক্তিকে চিৎশক্তি বলা হয়—ইহা পরমেশ্বর হইতে অ-ভিন্ন। ইঁহার নাম স্বরূপশক্তি। বিন্দুরূপী শক্তিও পরমেশ্বরের শক্তি। কিন্তু ইহা অচিৎ শক্তি। ইহা শুদ্ধ মায়ার ন্যায় মলিন নহে। বিন্দুশক্তি পরিগ্রহ শক্তি। মায়া এবং মহামায়ার মধ্যে ভেদ হইতেছে মায়া মলিন জগতের উপাদান আর মহামায়া বা বিন্দুর নামান্তর কুণ্ডলিনী—শুদ্ধ জগতের উপা-দান। শুদ্ধ জগৎ পরমেশ্বর হইতে অন্তঃসঙ্কল্পের প্রভাবে আবির্ভূত হয়। অশুদ্ধ জগৎ পরমেশ্বর প্রভাবে মায়া হইতে আবির্ভূত হয়। শুদ্ধ জগৎ জড়, অশুদ্ধ জগৎও জড় কিন্তু শুদ্ধ জগতের উপর সবিকল্প জ্ঞানের প্রভাব পড়ে না। কিন্তু (মায়া) অশুদ্ধ শক্তির উপর সবিকল্প জ্ঞানের প্রভাব আছে। বিন্দু অর্থাৎ কুণ্ডলিনী পরমেশ্বরের নির্বিকল্প জ্ঞানের প্রভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মায়া পরমেশ্বরের নির্বিকল্প জ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। মায়া ঈশ্বরের অধীন। ইহা মায়িক জগতের উপাদান। ঈশ্বরতত্ত্ব অবিকল্প জ্ঞানের দ্বারা মায়াকে ক্ষুব্ধ করে। মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া মায়িক জগতের কার্যরূপে পরিণত হয়। ঈশ্বর বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ। বিন্দু অথবা মহামায়া ঈশ্বরের জ্ঞানের অধীন নহেন। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বরের জ্ঞানের প্রভাবে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া শুদ্ধ জগতের আবি-র্ভাব সূচনা করে। বিন্দু পরিগ্রহশক্তি, কেননা ইহা উপাদান। চিৎশক্তির কর্ম-বাহিনী শক্তি। কেননা ইহা চিদাত্মশক্তি হইতে অভিন্ন। এই পরম্পরা সবসময় মনে রাখা উচিৎ। শুদ্ধ জগতের নীচে হইতে উপরে—শুদ্ধ বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শিব ও শক্তি। বিন্দু বা কুণ্ডলিনী শুদ্ধ শক্তি—নির্মল দেহের উপাদান। মায়া মলিন দেহের উপাদান, শুদ্ধ দেহের নামান্তর

বৈন্দব দেহ। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির প্রভাবে বিন্দু (বস্তুতঃ জ্যোতি-স্বরূপ) দেহাকারে পরিণত হয়। ইহার নাম জ্ঞানদেহ। ইহা পরমেশ্বরের কৃপা হইতে হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি অথবা চিদাকাশ মহামায়ার নামান্তর। শিষ্য যখন দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তখন সে জ্যোতির্ময় বৈন্দব দেহ লাভ করে। ইহা দুই স্থিতিতেই সম্ভব—যখন মহাপ্রলয় হইতে জগৎ ধ্বংস হয় তখন তাহার মলপাক পূর্ণ হয়—পরমেশ্বর বৈন্দব দেহ সংযোগ করিয়া দেন। এই দেহ কুণ্ডলিনী হইতে প্রস্তুত। যখন জীব মায়িক দেহে থাকে তখনও মলপাক হইলে বিন্দুর দেহ লাভ করে। কিন্তু প্রলয়স্থিতি এবং সৃষ্টিকাল স্থিতিতে অন্তর আছে। প্রলয়কালে মলপাক হইলে মায়ায় একই বৈন্দব দেহ মেলে। পরন্তু সৃষ্টিকালে মলপাক হইলেও বৈন্দব দেহ মেলে কিন্তু মায়িক দেহের সঙ্গে—দুই দেহই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মিলিত থাকে—এক মায়িক দেহ অপরটি বৈন্দব দেহ। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সুপ্তবৎ থাকে। ইহা ক্ষুব্ধ হইলে ইহা হইতে শুদ্ধ শব্দের আবির্ভাব হয়, ইহাকে 'নাদ' বলে।

মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত মানুষের দেহে মূল ছয়টি চক্র আছে। মূলাধারে যে চক্র আছে, উহাতে চারিটি মাতৃকা আছে—নাম 'চতুর্দল কমল'। কমল এবং চক্রে ভেদ আছে। যখন কুণ্ডলিনী সুপ্ত থাকে তখন উহার নাম চক্র। কুণ্ডলিনী জাগিলে নাম হয় 'কমল'। চক্রাবস্থায় যে মাতৃকা আছে কমল অবস্থায় উহাই কমলের দল। এইপ্রকারে মানুষের দেহে সুষুম্না নাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছয়টি চক্র আছে—পাঁচটি চক্র পঞ্চভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর উপরের চক্র চিত্তের সহিত সম্বন্ধযুক্ত—অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদি।

মূলাধারে যখন কমল ফোটে তখন উহাতে চারিটি দল থাকে। উহার উপরে স্বাধিষ্ঠানে ষট্‌কমল ছয় মাতৃকার বিকাশ এখানে হয়। মণিপুরে দশদল কমল—দশমাতৃকার প্রকাশ, হৃদয়ে অনাহত চক্রে দ্বাদশদল কমল্। কণ্ঠস্থলে ষোড়শদল কমলের বিকাশ হয় আর ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র আছে— ওখানে দ্বিদল কমলের বিকাশ। সমষ্টিতে পঞ্চশৎ মাতৃকা—পঞ্চদশ কমল। ইহাতে রহস্য আছে। দ্বিদলে দুই বর্ণ আছে—উপরে হ'কার থাকে নীচে স'কার থাকে। এই হ'কার বিন্দুযুক্ত। মূলাধারে যে চতুর্দল কমল আছে, উহাদের সর্বনিম্নে সকার থাকে—ইহা বিসর্গযুক্ত। উপরে হ'কারে বিন্দু, নীচে স'কারে বিসর্গ এই প্রাণশক্তি হয়। যোগীর নিকট ইহা 'সোঽহং' হয়। যে অজপা জপ করে সেই ইহার রহস্য জানে। শরীরের ভিতর অসংখ্য নাড়ী আছে—বাহাত্তর হাজার—মোক্ষ নাড়ী বত্রিশ। মোক্ষ

চতুর্দশ অথবা দ্বাদশ—উহাতে মুখ্য তিন ঃ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইড়া বাম মার্গে এবং পিঙ্গলা দক্ষিণ মার্গে—ইহার গতি সরল নহে। এই দুই মার্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি প্রবাহিত। এই দুইয়ের মধ্যে সরলগতি আছে। ইহাকে সুষুম্না বলে। ইহার পরে বজ্রনাড়ী, তারপরে চিত্রিণী নাড়ী, তারপরে ব্রহ্মনাড়ী—ইহা অখণ্ড।

সুষুম্নায় প্রবেশ ব্যতীত এই মহাশক্তির জাগরণ হয় না। সুষুম্নায় প্রবেশ তখনই সম্ভব যখন ইড়া এবং পিঙ্গলার আবর্ত কাটিয়া যায়। কিন্তু ইহা কালের আবর্ত। পরন্তু সুষুম্না কালের নাশকারী। যোগীর পরম লক্ষ্য হইতেছে সুষুম্নায় প্রবেশপূর্বক ব্রহ্মনাড়ীতে স্থান গ্রহণ। বেদান্তের আনন্দময় কোষ ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে যাইবার ক্রম আছে। প্রত্যেক চক্রে তিনটি অংশ—সর্বাগ্রে মাতৃকা অথবা বর্ণমালা, তারপর নাদ এবং তারপর বিন্দু। মাতৃকাকে ব্যবহারভূমিতে 'কলা' বলা হয়।

বিন্দু, নাদ এবং কলা ইহাই তিন অংশ। প্রথমে প্রবেশ করিতে হয় মূলাধারে। প্রবেশ করিবার জন্য গূঢ় রহস্যদ্বার আছে। এই দ্বার খুলিতে হয়। ইহা সবসময় বন্ধ থাকে। যখন বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর সংঘর্ষের সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন নীচে হইতে চিদগ্নির উদ্দীপন হয়—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির শক্তিনাশ এবং প্রাণ অপান যখন সাম্য হয় তখন নাম হয় 'সমান'—সাম্য হইতে যে অগ্নির বিকাশ হয় তখন উহার নাম হয় 'উদান', ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশের সময় ব্যান।

এই চিদগ্নির দ্বারা মূলাধার চক্রের প্রাচীর গলাইতে হয়—মূলাধারের প্রাচীর মাতৃকাময়। এই প্রাচীর গলিবার পর দ্বার খুলিয়া যায়। পরপর চারিটি মাতৃকা আছে। প্রত্যেক মাতৃকা উহার সংস্পর্শে গলিয়া যায়—বর্ণভাব কাটিয়া যায়—নাদ-ভাব আসে। নাদ-ভাব আসিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার ঊর্ধ্বমুখী গতি শুরু হয়—মূলাধারের ঊর্ধ্বগতি হয়। বিন্দুস্থান সুষুম্না নাড়ীর একটি স্টেশন। মূলাধারের অন্য বর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। বর্ণ গলিয়া নাদ হইলে তখন সম্বন্ধযুক্ত হয়।

সুষুম্নায় বৈশিষ্ট্য আছে—সুষুম্নায় নিরন্তর ঊর্ধ্বগতি চলে। এইপ্রকারে চক্রভেদ হয় এবং বিন্দুতে পরিণতি লাভ ঘটে। আজ্ঞাচক্রে একমাত্র বিন্দু থাকে। মাতৃকা সমাপ্ত হয়। এখানে শিবনেত্র থাকে—জ্ঞানচক্ষু—ইহা খুলিয়া যায়। এখানে দুইটি মার্গ আছে—একটি সহস্রদলে যাইবার মার্গ আর একটি ব্রহ্মরন্ধ্রে যাইবার মার্গ—একটি পরমেশ্বরে যাইবার এবং অপরটি ব্রহ্মে যাইবার মার্গ।

কামকলা প্রসঙ্গ

(প্রশ্নকর্তা হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

কামকলার মধ্যে কামটা হচ্ছে কি? বিন্দু—কামাখ্যা বিন্দু (হেমেনদা বললেন, মহাবিন্দু তাকে বলতে পারি?)—এই বিন্দুটা হল কি? শিবশক্তির সামরস্য—তাহ'লে শিব আর শক্তি—শিব হ'ল static আর শক্তি হ'ল dynamic—এই দুটো পরস্পরকে counteract করে শিব static হ'লেও শক্তি আছে বলে static হয় না—শক্তি dynamic হ'লেও শিব আছে বলে শুধু dynamic হয় না—এ ওকে contradict করছে, ও ওকে contradict করছে। এই হ'ল background—এটার নাম হ'ল স্থিতি। আর সৃষ্টি এবং সংহার যে হয় সেটা হয় অগ্নি আর সোমের দ্বারা—অগ্নির দ্বারা সংহার হয় আর সোমের দ্বারা সৃষ্টি হয়। বাইরেও যখন দেখি—আগুন যদি কিছু পোড়াবে তাহ'লে তার একটা fuel দরকার হয়—কাঠ, ইঁট যাই হোক না কেন—সেটা না হলে তো তুমি পোড়াতে পার না। সেটা তো হ'ল সোমের জিনিষ। কাজেই সে সোমকে আশ্রয় না ক'রে—ঐ সোমকে গ্রহণ না ক'রে অগ্নি cannot function at all—তেমনিতর সোম cannot function without অগ্নি। সোমটা হচ্ছে বিন্দু—চন্দ্রবিন্দু। এখন এই বিন্দুটাকে গলাতে হলে অগ্নি দরকার। কাজেই সোমের নিজের কাজের জন্য অগ্নি দরকার, আর অগ্নির নিজের কাজের জন্য সোমের দরকার। এটা হ'ল সৃষ্টি আর সংহারের ব্যাপার—সৃষ্টি আর সংহার হ'ল যেন দেবীর দুটি স্তন আর কপালের মধ্যবিন্দু হ'ল সূর্য—স্থিতি। এই যে স্থিতিটা হচ্ছে on a level with সৃষ্টি এবং সংহার, কেননা সৃষ্টি আর সংহার দুটো যখন সমরস হয়ে যায় তখন হয় স্থিতি। আমি সৃষ্টি আর সংহার বলছি না—আমি বলছি শিব আর শক্তি। শিব হচ্ছে প্রকাশ আর শক্তি হচ্ছে বিমর্শ—এই দুটো যদি তুল্যবল হয়—সামরস্য হয় সেইটা হ'ল সূর্য—সেইটা হল কামাখ্য বিন্দু—সেইটাই মাঝখানেতে আছে।

আর এদিকে দেখ যখন নীচে নামব তখন হ'ল হার্দ্ধকলা—হার্দ্ধকলা হ'ল যোনিপ্রবেশের থেকে। হার্দ্ধকলা আর এদিকেতে সোম আর অগ্নি—অগ্নি হ'ল প্রকাশ আর সোমটা হ'ল ঘৃতের মত—ঘৃত যেমন আগুনের তাপেতে

গলে যায় তেমনিতর সোম স্থানীয় যেটা, সেটা গলে, flow করে। এই যে flowটা এটাই হল চিৎ-শক্তি—সংবিৎ। এই যে সংবিৎটা এই সংবিতের সঙ্গে সৃষ্টির basisটা হয় অর্থাৎ ৩৬টা তত্ত্ব উৎপন্ন হয়—৩৬টা তত্ত্বের মধ্যে শিবশক্তি আছে—তাহ'লে এখন দেখ শিবশক্তি আবিভূ'ত হয় সৃষ্টির মধ্যে, কেননা বিশ্ব রয়েছে—শিবশক্তিকে বাদ দিয়ে তো বিশ্ব থাকতে পারে না। শিবশক্তির আবির্ভাব যে হয় সেটা হ'ল ঐ basisএর থেকেই আর এই শিবশক্তির এই backgroundএ রয়েছে ঐ শিবশক্তি। তাহ'লে দুই শক্তির মধ্যে difference রয়েছে—একটা শিবশক্তি হ'ল সৃষ্টির অন্তর্গত আর একটা শিবশক্তি হ'ল স্থিতির অন্তর্গত। স্থিতি মানে হচ্ছে শিবশক্তি যখন সমরস হয় আর সৃষ্টির ভিতরে সেটার flow হবে, তাহ'লে flow অবস্থাতেই হোক আর rigid অবস্থাতেই হোক শিবশক্তি ছাড়া তো আর কিছুই হচ্ছে না। এখন এর ভিতরেতে কামকলা হ'ল কোনটা—এটাই ভাববার জিনিষ—বলা হয়না 'অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ'—তাহ'লে অকারটা হ'ল শিব আর হকার অন্ত্যকলারূপ বিমর্শ। একটা হ'ল অ, আর এটা হ'ল হ, তা'র থেকে তৈরী হ'ল অহং—ম্ হ'ল বিন্দু।

অহংটা হ'ল সমস্ত বর্ণমালার সমষ্টি যেটা—অহং represents the entirety—entire energy field যেটা সবটা cover করছে। আর এইটার basisএ ওখানে রয়েছে। কিন্তু basisএ যে রয়েছে সেটা রয়েছে শক্তিরূপেতে—যেমন একটা যাচ্ছে উত্তরমুখে আর একটা টানছে দক্ষিণদিকে—ভয়ানক tendency বা force তা'র। দুটো বল যদি সমান হয় কোথায় যাবে সে? তাহ'লে সে কোনোদিকেই যাবে না—এই যে অবস্থাটা সেটা হ'ল শক্তির অবস্থা। এদিকে যেতে গেলে শক্তি বিরোধ করে, ওদিকে যেতে গেলেও শক্তি বিরোধ করে—এটা permanently at the back রয়েছে। শিব-শক্তির সামরস্য indicates that এবং সেটাই হ'ল স্থিতি, সেটাই হ'ল সূর্য। গায়ত্রীমন্ত্রে যে জিনিষ আছে এটাই হ'ল সেটা—সেটা হ'ল সূর্য, সবিতা। এই যে সবিতা, backgroundএ যিনি, আর যেটা নাকি তত্ত্বের অন্তর্গত—গায়ত্রীরূপ যেটা—এই দুটোর মধ্যে একটু difference আছে। তোমার এখানে যে কলাটা—কলা থেকে যাচ্ছে—হার্দ্ধকলা হ'ল কোনটা? 'হ'য়ের অর্দ্ধ বিসর্গ। বিন্দু-বিসর্গ। তা হ'লে বিসর্গের অর্দ্ধ। অর্দ্ধ কেন বলা হ'চ্ছে? তারপরেই আটকে যাছে। কে আটকাচ্ছে তা'কে? 'হ'য়ের অর্ধেক 'ক্ষ'। আটকাচ্ছে কে? 'ক্ষ', কূটাক্ষর—কূটাক্ষর পর্যন্ত reach করলেই একটা field তোমার হ'য়ে গেল। অকার থেকে হকার পর্যন্ত এসে

গেলেই আটকে গেল—তারপর অ'কার থেকে হ'কার হ'বে, তার সঙ্গে তোমার কোন connection নেই—এরকম অনন্ত আছে।

তা' হ'লে তোমার জিনিষটা দরকার হচ্ছে কী? কি ক'রে অহংটা তৈরী হয়। অ—হ, পরে বিন্দু (ং) যোগ হয়—ফলে অহং। এই অহংটা ফুটাবার জন্য সৃষ্টির বীজটা। এই জিনিষটা কী? বাক্, বিসর্গ। আমাদের বৈখরী বাক্—অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি। বৈখরী বাকে যাচ্ছ কিসের জন্য? না, অহংটাকে পাবার জন্য, আর এটা না পেলে unending সৃষ্টি roll করে যে—তাহ'লে অহংভাব আসবে না, মুশ্‌কিল হয়ে যাবে—তাহ'লে বেদান্তের দিক দিয়ে শংকর মত। গোলমাল এসে যাবে।

প্রঃ। কামকলা বিলাসের মধ্যে কিছু light পাওয়া যায় কি?

উঃ। আমাদের প্রাচীন tradition যেটা, তা'র মধ্যে ধরা হ'য়েছে। অহংটাকে জাগাবার জন্যই না শক্তির বিকাশ, নইলে কিসের জন্য শক্তির বিকাশ? সৃষ্টির পূর্বে মাতৃকাস্বরূপ তো থাকতে পারে না। কাজেই সৃষ্টি পূর্ণ হ'ল কখন? না, অ থেকে হ পর্যন্ত এসে গেল, অংকে নিয়ে ঘুরিয়ে দিলে সেটা তখন অহং হ'য়ে গেল। তাহ'লে ছিলে 'হ'তে, আবার 'অ'তে চলে গেলে, আর কূটাক্ষরের কারণেতে অনন্ত সৃষ্টির সঙ্গে মিলন হ'ল না সেটা।

অ থেকে আ বেরুল—আ বেরুলেই এটা স্ফুরণাত্মক হ'য়ে গেল। অ থেকে আর একটা অ যখন বেরোয় তখন স্ফুরণ হয়। এই স্ফুরণ থেকেই ইচ্ছার উদয় হয়। স্ফুরণটা না হ'লে ইচ্ছাটা আসে না এবং সেটা 'আ'র উপরেতে। অ আর আ একই জিনিষ কিন্তু অ থেকে সৃষ্টি হয় না, আ থেকে সৃষ্টি হয়। আ'টা হ'লে কি হ'ল? না, অ থেকে একটা অংশ বেরিয়ে গেল। এই যে বেরিয়ে গেল এই বেরিয়ে যাওয়াতে একটু ন্যূনতা এল। এই যে আনন্দ অবস্থাটা এই ন্যূনতাতে সূচনা হয়—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। চৈতন্যের থেকে কিছু সৃষ্টি হয় না, সেটা প্রকাশ। আনন্দ হয় আ থেকে, আনন্দটা ক্ষুব্ধ হয়ে যায়, ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েই ইচ্ছার উদয় হয়। ইচ্ছা না হ'লে সৃষ্টি হ'বে কি ক'রে? তখন ইচ্ছার উদয় হ'বে, তারপর ঈশিতার উদয় হ'বে—ক্রমশঃ চলবে সেটা—অনেক চমৎকার জিনিষ। এ কোনো particular systemএর ভাবধারা নয়—এ অনেক দূরের কথা—যেখানকার কথা সেখানে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই তৈরী হয়নি। প্রকাশস্বরূপ সেটা, স্ফুরণ হয়নি।

আমরা যে জগতের আলোচনা করি সেই জগতের সৃষ্টিটা কোন্ জায়গা থেকে হয়? ঈশ্বর থেকে হয় তো? ঈশ্বর থেকে হ'য়ে সে জিনিষটার বীজ

তৈরী হ'য়ে যায়। ঈশ্বর না হ'লে বীজ হয় না। সেটা হ'ল কাম। বীজ-টাই হ'ছে উন্মেষ। উন্মেষটা বড় চমৎকার জিনিষ—ইচ্ছার থেকে উন্মেষ হয় —উন্মেষ থেকে ঊর্মি হয়। উন্মেষটা কি ? যে জিনিষটা জগতে নেই ; ইচ্ছা যখনই আছে, তখনই বীজরূপে আছে, ইচ্ছাটা যখন হয়নি তখন তো বীজ-রূপেও নেই, possibility মাত্র আছে আনন্দরূপে। তারপর আনন্দের মধ্যে অভাবটা যখন এসে গেল তখন ইচ্ছার উদয় হ'ল, আর ইচ্ছার উদয় হলেই বীজ তৈরী হ'বে। আনন্দটা হচ্ছে মাতৃশক্তি—বিশ্বমাতা, জগন্মাতা—আর প্রকাশটা হ'ল শিবরূপী, তারও উপরের জিনিষ। আনন্দের মধ্যে সৃষ্টি হয় কি ক'রে ? হেমেনদা বললেন ঃ 'ইচ্ছার দ্বারা'। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইচ্ছাটা হয় কি ক'রে ? আনন্দের মধ্যে, মা আছেন স্বরূপেতে। অ হচ্ছে প্রকাশ— অ, অ—তারপর হ'ল। আনন্দেতে একটা অভাব এসে গেল, সেই অভাবটাকে পূরণ করবে আনন্দ সৃষ্টির দ্বারা, তখনই এল ইচ্ছা। ইচ্ছাটার যে উদয় হ'ল সেটা আনন্দকে আশ্রয় ক'রে। আনন্দটা পূর্ণত্বের ভাণ্ডার। অ তো তাও নয়, অ তো পূর্ণেরও অতীত জিনিষ—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সব সেখানে একাকার। অ থেকে সৃষ্টি হয় না। অ থেকে আ বেরোয় কিন্তু আ হ'ল বহির্মুখ—আনন্দ হ'ল পূর্ণত্বের ভাণ্ডার—যা চাইবে তুমি সবই আছে সেখানে। তারপর কি হ'ল ? একটা ইচ্ছা আস্‌ল, ইচ্ছা যেই আস্‌ল এই হ'ল beginning of creation। ইচ্ছাটা আসলে আনন্দের। তখন কি হয় ? ইচ্ছার object হচ্ছে এষণীয়, তাহ'লে এষণীয় হ'য়ে যাবে। দোকানে অনেক জিনিষ আছে, তুমি না চাইলে সে দেবে কেমন ক'রে ? কি জিনিষ চাইবে তুমি—চাওয়াটাই হচ্ছে অভাব—অভাববোধের intimation এতগুলো হওয়া চাই তো। ইচ্ছাটা হ'ল সৃষ্টির অঙ্কুর, বীজ—সৃষ্টির অতীত আনন্দটা backgroundএ। কি হ'বে সৃষ্টি ? এখন তুমি যেটা ইচ্ছা করছ, যা-ই তুমি ইচ্ছা কর না কেন। Concretely ধর, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধর—আমার রসগোল্লা চাই—তা' হ'লে আমার রস চাই, ছানা চাই, চিনি চাই—আমি সেগুলো তো চাচ্ছি না। আমার দরকার নেই সেটা—সেই জিনিষের মধ্যে in terms of রসগোল্লা আমার দরকার, অন্য কিছুর আমার দরকার নেই। এই ইচ্ছাটা প্রকাশ হ'ল তোমার। তা' হ'লে তুমি বীজ পেয়ে গেলে। বীজ পেয়ে গেলে তখন কি হ'ল ? তখন হ'ল উন্মেষ—উন্মেষটা হ'ল জ্ঞান। জ্ঞানটা আসল কোন্ সময় ? যখন তুমি ইচ্ছা করেছ। ইচ্ছাটা মানে sense of want। Want for what ? Say 'S'—তখন 'S' appears কোথা থেকে ? ঐ পূর্ণের থেকে। সেই যে 'S' জিনিষটা হ'ল সেটা হ'ল উন্মেষ। তা' হ'লে

উন্মেষ মানে কি হ'ল ? যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে beginningটা হ'ল। এখন লোকে দেখতে পাবে না, ছুঁতে পারবে না, কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু তা' হ'লেও তা'র যে নাম-রূপ সেটা ফুটে উঠল। কা'র কাছে ফুটে উঠল ? যা'র জ্ঞান হ'য়েছে। (এ জ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান নয়—আমি যেখানকার কথা বলছি সেখানে ঈশ্বর বলে তখনও জিনিষ হয়নি)। উন্মেষ অবস্থা হ'লে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কেন দেখতে পাচ্ছে না সেটা ? কেননা, প্রকৃতির গর্ভে আসেনি সেটা—এটা beyond প্রকৃতি—প্রকৃতি হ'ল অনেক পরে, অনেক নীচে—এটা পুরুষের ব্যাপার। সৃষ্টি যখন হয়, সন্তান যখন জন্মায় আগে পুরুষের গর্ভে বীর্য-রূপে আসে, তারপরে প্রকৃতির গর্ভেতে যায়। তারপর প্রকৃতি সেটা পোষণ করেন, তারপরে বের ক'রে দেন, তখন জগতের লোক সেটা দেখতে পায়।

তা হ'লে আমি যখন উন্মেষ অবস্থায় দেখছি, আমি আমার স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা দেখছি সেটা। কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছি ? ঠিক আনন্দের বাইরেই, কেননা আমি আনন্দের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আবার আকাংখা করেছি, কাজেই সেটা সৃষ্টির মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু সেটা খাওয়ার জিনিষ নয়, দেখবারও জিনিষ নয়। সেটা কি হ'ল তা' হ'লে ? তখন কি হ'বে ? তুমি যে আকার দেখতে পাচ্ছ সেটাকে বলে উন্মেষের পরে ঊর্মি। ঊর্মি মানে কি ? ঊর্মি মানে জ্ঞানেতে যে জিনিষটা তুমি পেয়েছ সেই জিনিষটা একটু ঘনীভূত হ'য়ে এল। জ্ঞানটা জ্ঞেয় হ'বে তা'র উন্মুখ অবস্থা। জ্ঞান আর জ্ঞেয় একটাই জিনিষ কিন্তু এখন ওটা জ্ঞানরূপেতে আছে। কিন্তু যখন ঊর্মি হ'বে তখন হ'বে জ্ঞেয়ের আকার—জ্ঞেয় নয় অথচ জ্ঞেয়ের আকার। Knowledge আর Knowable এইরকম জিনিষ এটা—যাকে বিজ্ঞানবাদ বলে, Idealism—এটা Idea, দেখতে পাওয়া যাবে, একটু তাতে ভ্রান্তি নেই—কিন্তু এ জগতের কেউ দেখতে পাবে না, সুতরাং তা'র কাছে তা না থাকার মতন। তারপরে জ্ঞেয় levelএ নিয়ে আসলে so called জ্ঞেয় level ঊনতা, তখন প্রকৃতিতে যাবে। বীর্যের মূল অবস্থা যেটা সেই জিনিষটা যোনিতে প্রবিষ্ট হয় না। এজন্য প্রকৃতি হ'চ্ছে এ, ঐ, ও, ঔ। এই হ'ল প্রকৃতি—প্রকৃতিতে ফেলে দিলে, নিঃশেষ করলে যখন, তখন তোমার আর কিছু করবার নেই। তারপর প্রকৃতির function এটাকে নিয়ে—গর্ভসঞ্চার ক'রে দিলে তুমি, তারপরে প্রকৃতি এটাকে পুষ্ট করবে। তারপর পূরণ হ'য়ে যাবে, তখন হ'বে বিন্দু সেটা—তখন দেখা যাবে চমৎকার রসগোল্লা গরম গরম রয়েছে—তখন একজন কেন, প্রত্যেককে দিতে পারবে। তখন এটা objective হ'ল—objective ক'রে

দিল কে ? এটার নাম হ'ল realisation, objectification—প্রকৃতির গর্ভে আসবার পরে এটা হয়। এই যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আছে, সেটা তো এই—(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে)।

এইরকম যে কোন জিনিষ ইচ্ছার levelএ যখন নিলে, তারপরে উন্মেষ হ'য়ে যাবে, উন্মেষ হ'য়ে গেলে তুমি দেখতে পাবে। যদি না হয়, তা হ'লে তুমি বুঝতে পারবে হ'ল না। তারপর প্রকৃতির গর্ভে ফেললে, তারপর প্রকৃতির গর্ভ থেকে যখন বেরুল তখন সকলেই দেখতে পেল। এটা হ'ল বিন্দু—বুঝতে পারছ ? বিন্দু উৎসর্গ হয়ে গেল, তখন বিসর্গ হ'য়ে যাবে। এর পরে হবে বৈসর্গিক সৃষ্টি, আর এটা হ'ল বৈন্দব সৃষ্টি।

বিবিধ আলোচনা

প্রশ্ন ঃ ষড়দর্শনের মধ্যেও কি কোন ফাঁক রয়েছে ?

উত্তর ঃ ষড়দর্শন কিছু না—ওটা একটা philosopy যেমন European philosophy সেইরকম আর কি—একটা আলাদা লাইন আর কি। কিন্তু যা প্রকৃত জিনিষ—infiniteএর ভিতরে যেটা হচ্ছে তার নামগন্ধও নেই ষড়দর্শনে। এখন দেখতে পাই তো! Christian mysticsদের মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ আছে—বৈষ্ণবদের মধ্যেও আছে কিন্তু এটা অন্য জিনিষ—এটা creationএর মধ্যে এখন পর্যন্ত হয়নি। বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছে তখন তিনি প্রকাশ করেননি। সব প্রকাশ হ'ল, এখন হবে—তবে indication আগে একটু বলে গেছেন কিন্তু ধরতে পারা যায়নি। যখন প্রথম গুরুদেবকে দর্শন করতে গেলাম অনেক দিনের কথা—আমি যখন এম-এ পাশ করলাম, চাকুরীতে ঢুকলাম সেই সময়েতে হনুমান ঘাটে (তখন আশ্রম হয়নি) দেখা করতে গিয়েছিলাম—দেখা করতে গিয়ে অনেক কথা বললেন টললেন। তারপর বললেন যে, যা আমি খুঁজছিলাম তা এতদিনে পেলাম। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না—অন্যরাও কিছু বুঝতে পারল না। অথচ আমার সঙ্গে দেখা হলে বললেন, যা খুঁজছিলাম তা পেলাম। তারপর বহুকাল পরে indication দিয়েছিলেন—গুরুদেবের পত্রের মধ্যে indication আছে। অর্থাৎ তোমাকেই খুঁজছিলাম এতদিন পর্যন্ত। অথচ আমি তো অজ্ঞানী। খুঁজছিলেন জ্ঞানগঞ্জের ভিতরে। আমার কিছু করণীয় আছে—কর্ত্তব্য আছে—কিন্তু সে যে কি তাতো পাইনি। তিনি তো স্পষ্ট করে বলেননি। এখন বুঝা যায় যে, জিনিষ প্রকাশ হবে। তর্কবিতর্কের ছলে বলেওছেন সব কিন্তু প্রকাশ করেননি। ভারী অদ্ভুত জিনিষ—সময় আসুক তখন ধরা যাবে। আগে মনে করতাম এ একটা অলৌকিক বিভূতির ব্যাপার—এখন দেখি ব্যাপার আছে—pre-arranged সব জ্ঞানগঞ্জের। অখণ্ড মহাযোগ এখন বুঝতে পারা যায়। গুরুদেবের দেহরক্ষার পরে আমরা মহানিশার ক্রিয়া করতাম পাতালেশ্বরে। অখণ্ড মহাযোগের রহস্য এখন ধরা পড়ে। আমরাও জানতাম না অথচ করিয়ে নিলেন। এখনও বলবার মতন না—হবে যখন তখন বুঝা যাবে। তবে নিজে বুঝতে পারি এটা এই, এটা এই, এটা এই।

প্রশ্ন ঃ এই ভৌতিক জগৎ এখন যেমন আছে মহাপ্রকাশের পর তার কি অবস্থা হবে ?

উত্তর ঃ না থাকলে আনন্দ কি ! সবই থাকবে। সবই থাকবে—ভৌতিক জগৎ থাকবে—কালের জগৎ থাকবে—কালাতীত শুদ্ধাবস্থাও থাকবে—নূতন হ'ল কোনটা এখন যেটা বলছি—খুলে যাবে যেটা—এখন পর্যন্ত প্রকাশ নেই। আগে খোলেনি এমনকি সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যেও খোলেনি। সিদ্ধ পুরুষরা একটা limitএর মধ্যে ছিল—সিদ্ধ পুরুষরা ভবিষ্যৎ দেখতে পেত—অতীত past দেখতে পেত। সে অন্য জিনিষ, এটা নয়। এ অদ্ভুত জিনিষ—এ হচ্ছে ভিতরের রাজ্যের গুপ্তরহস্য, যেটা প্রেমকুঞ্জ—ভগবানের প্রেমলীলার জায়গা যেটা—এ প্রেমলীলা রাসলীলা নয়—রাসলীলা যোগমায়ার ভিতর—এ আলাদা। পণ্ডিতরাও জানেন না—ভাগবতের টীকা করেন, ব্যাখ্যা করেন—তাঁরা ব্যাখ্যা করেন—ভাল ভাল ব্যাখ্যা আছে—কিন্তু এ জিনিষ নয়। গুপ্ত জিনিষ কিনা ! কালকে নাশ করার জন্য —কালকে নাশ, মানে, কালের গতি যেটা সেটাকে দাবিয়ে প্রকৃত সত্যের গতি যেটা সেটাকে প্রকাশ করা। সেটা তো নেই কোথাও অথচ লীলা চাই—যে লীলা আছে সেটা যোগমায়ার মধ্যে। ভাগবতে লীলা করলেন বটে কিন্তু মায়ার মধ্যে, যোগমায়া দিয়ে। চাপা জিনিষটা প্রকাশ হবার কথা এখন। চার যুগের মধ্যে প্রকাশ হয়নি, গুপ্ত আছে। কিছু কিছু আভাস প্রভু জগদ্বন্ধু পেয়েছিলেন—এত detailed পাননি। সময় হয়নি তখনও। তার ভিতরে সেই জিনিযটা ingrained ছিল। অরবিন্দ কিছু ইংগিত পেয়েছিলেন—তার চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন Mother। আশা ছিল—শেষ করতে পারেননি—দেহ চলে গেল। এজন্য অরবিন্দের কাছাকাছি Motherএর দেহকে রাখা হয়েছে। Motherএর যে জিনিষটা অপূর্ণ রইল সেটা পাবার চেষ্টা করা। Motherএর খুব বড় personality ছিল। অরবিন্দ যে জিনিষটা দেখেছেন এবং পেয়েছিলেন সেই জিনিষেরই personification ছিলেন Mother। Motherএর personality wonderful—এটা হচ্ছে সার জিনিষ—গুপ্ত জিনিষটা প্রকাশ হবার নয়। Function নেই। গুরু এই দেখা দেয়। অর্থাৎ পথ আছে সেই পথ দেখা যায়, আর কিছু নয়। নিজেও সেইগুলি করেন। অনেক জিনিষ বুঝবার আছে। গুপ্ত কথা সব সকলকে বলা যায় না।

সিদ্ধি মায়ের শিষ্য প্রভাতের মধ্যে অনেক জিনিষ খুলে গেছে। একটা গুপ্ত জিনিষ রয়েছে এটা বলেছেন তিনি। সিদ্ধি মায়ের ভিতরে অনেক জিনিষ খুলেছিল।

আসল জিনিষটা বলে দেব—গুহ্য জিনিষ আছে কিনা।

২রা জুলাই, ১৯৭৪—সকাল ৮-১৫ মিঃ, আনন্দময়ী আশ্রম

প্রশ্ন ঃ আপনি গতকাল বলেছিলেন অব্যক্তকে ব্যক্ত করার পদ্ধতি তাকে in short ক্রিয়া বলা হয়।

উত্তর ঃ অব্যক্ত যেটা সে জিনিষটা অব্যক্তই আছে, কিন্তু ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা সেটা ব্যক্ত হয়। এই হচ্ছে আসল কথা। এখন সেই ক্রিয়া নানারকমের হয়। ক্রিয়া মানে অনেক প্রকার হতে পারে। অব্যক্ত বলতে গেলে বলতে হয় অব্যক্ত কোন একটা স্তরেতে—তুমি যে স্তরে সেই স্তরেতে সেটা অব্যক্ত—কিন্তু আর একটা স্তর আছে সেখানে সেটা অনেক ব্যক্ত। কাজেই সেই অব্যক্তটা বাস্তবিক অব্যক্ত নয়। সেই স্তরেতে limited definition হয়ে গেল সেই অবস্থাটা। কাজেই যে জিনিষটা অব্যক্ত ছিল সেটা তো অব্যক্ত থাকল, একথা মনে রাখতে হবে। তোমার জায়গায় অব্যক্ত, কিন্তু তোমার জায়গা তো permanent নয়—কত জায়গা আছে। যেটা অব্যক্ত ছিল সেই জিনিষটা অব্যক্ত থাকল না তা হ'লে। কাজেই এটা limited term। অব্যক্তও নেই কিছু, ব্যক্তও নেই কিছু—একই জিনিষের ব্যক্তভাবও আছে অব্যক্ত ভাবও আছে, সেটা পূর্ণ অবস্থা। যার যেমন অধিকার সে তেমন বুঝে নেবে।

প্রশ্ন ঃ পরমগুরুদেব বলতেন ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর—এ ক্রিয়া কি?

উত্তর ঃ তিনি যে ক্রিয়া বলেছেন সেটা হ'ল যোগক্রিয়া—যে ক্রিয়া তিনি দিতেন সেটাকে ক্রিয়া বলতেন। চরমে যখন বুঝবে তখন ক্রিয়া করা এবং ক্রিয়া না করাতে কোন difference থাকে না। ক্রিয়া করাটা ক্রিয়া না করার মধ্যে আছে, আবার ক্রিয়া না করাটাও ক্রিয়া করার মধ্যে আছে। তাহ'লে সবটার মধ্যেই সব আছে—এটা না হ'লে তো ওটা হয় না। সাধারণ মানুষকে বুঝতে হ'লে তা করলে হবে না। বর্ণমালা যেমনতর। আমাদের তান্ত্রিকরা বর্ণমালা বুঝিয়েছেন কি—'অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রঃ প্রকাশঃ পরমঃশিব' —অকার যেটা সেটাই হচ্ছে প্রকাশ—পরম প্রকাশ—পরমশিব। তার উপরে আর কিছু নেই। তারপর ক্রমশঃ আ এল—আটাই আনন্দ—সেই আনন্দের থেকেই সৃষ্টি হয়। ইটা হ'ল ইচ্ছা—ইচ্ছাটা হ'ল ইচ্ছাশক্তি—সেটা হ'ল সৃষ্টির বিন্দু পর্য্যায়—তারপর হ'ল উন্মেষ—উন্মেষ অবস্থাটা হচ্ছে যাবে যাবে সেই অবস্থা। তারপর হ'ল যোনিতে প্রবেশ—একার যেটা সেটা হ'ল যোনি। সেটার ভিতরে সেই দুটো আছে। তার আবার

বিপরীত দিকে আছে ও আর ঐ short আর longএতে। তারপর অংতে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল। সবগুলো একত্র হয়ে গেল। তারপর বিসর্গ হয়ে গেল—ত্যাগ হয়ে গেল। ত্যাগ হয়ে গেলেই তারপরে ব্যঞ্জনবর্ণ আরম্ভ হয়ে গেল। ব্যঞ্জনের মধ্যে আবার বর্গীকরণ আছে—ক বর্গ চ বর্গ প বর্গ তারপর য়, তারপর উষ্ম—তারপরে গিয়ে হকার—হকারে গিয়ে বিন্দুতে পড়ল। হং হল আর আগে ছিল অ—অ আর হং—পূর্ণাহং। এই অহংএর মধ্যেই সব আছে—অহংএর বাইরে আর কিছু নেই। ইদংএর যাকিছু সবই অহংয়ের মধ্যে আছে।

বেদান্তে অত বেশী নেই। সংক্ষেপে বেদান্ত শুধু প্রকাশ নিয়ে—ব্রহ্মরূপেতে—বাকীটা পারেনি। বেদান্ত একটা দিক তো! ষড়দর্শনও একটা দিক। সব দিক দেখে বুঝতে হয়। কোনটাই বাদ যায় না।……

কোন জিনিষ বুঝতে গেলে একটা aspect ধরতে হবে, সমস্ত জিনিষ এক সঙ্গে বোঝানো যায় না। যেমন গুরুশিষ্য—গুরু একটা, শিষ্য একটা—কিন্তু গুরুশিষ্য কি দুটো জিনিষ অদ্বৈত বস্তুর মধ্যে? গুরুই বা কে শিষ্যই বা কে? কিন্তু সেটা তো বললে হবে না—যতক্ষণ জ্ঞানের উদয় হয়নি ততক্ষণ তো সবই আছে।

প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক গুরু তার আপন আপন শিষ্যকে ক্রিয়া দেন। বাবা তক্ষুনি বললেন, তোমার প্রশ্ন অন্যদিকে যাচ্ছে—তত্ত্বের দিক থেকে বল। তখন আবার বললাম, কোন গুরু নাম দেন আবার কোন গুরু ক্রিয়া দেন। বাবা বললেন, নামও ভাল, ক্রিয়াও ভাল, সবই সত্য। আবার এমন জায়গা আছে যেখানে নাম পাওয়া যায় না। নামটা হারিয়ে যায়। কোনটাই বেঠিক নয়, কিন্তু নিজে ঠিক জায়গায় বসা চাই। বাবা আবার বললেন, কোনটাই ভুল নয়। ভুল নয় মানে একটা শিশু বলছে, সে কোন্ জায়গা থেকে বলছে সেটা শিশু না হ'লে বোঝা যায় না।

প্রশ্ন ঃ আমার মনে হয় নামেতে যতটা না হয় ক্রিয়াতে তার থেকে বেশী হয়। বাবা বললেন, ক্রিয়া তো দরকারই—তারপর আবার বললেন, নামও তো ক্রিয়া।

প্রশ্ন ঃ সেদিন শচীকান্তদা এসেছিলেন—গুরুপূর্ণিমায় পূজা দেওয়া সম্বন্ধে—গুরু, কুমারী আর "নবমুণ্ডী মা, তিনজনের স্থিতি সম্পর্কে—। বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি ধরতে পারবে না যদি তুমি নতুন করে মনে করে নাও বুঝবে কি করে—"নবমুণ্ডীকে বুঝবে কি করে বল? আসল যে জায়গা, গুপ্তস্থান যেটা, এখন পর্যন্ত প্রকাশ হয়নি—সেটা

কোথায় বল তো ? নিজের ধারণা আছে কিছু ? আবার নিজেই বললেন, সেটাই হচ্ছে সরলরেখা, আর বক্ররেখা যেটা সেটা হচ্ছে তত্ত্ববিন্দু—সরলরেখা আর বক্ররেখা দুটো ভাল করে বোঝ—সরলরেখা কোনটা ? ষট্‌চক্রের ভিতরে উর্ধ্বেতে তিনটে বিন্দু আছে—সহস্রদল কমলেতে, মস্তকেতে, কণ্ঠদেশে হৃদয়ের উপরেতে—এই হ'ল তিন আর হৃদয়ের নীচে নাভি থেকে তিনটে —একটা হচ্ছে অধোমুখ আর একটা হছে উর্ধ্বমুখ। আর মাঝখান যেটা সেটা অধোমুখও নয় উর্ধ্বমুখও নয়—দুটো meet করেছে—যেখানে একটা বিরাট জ্যোতি সেখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও কিছু লাগে না। সেখানে প্রকাশ রয়েছে সেটাকে বলে হৃদয়—হৃদয়, দহরাকাশ বলে ওটাকে। প্রাচীন বৈদিকরা ধারণা করেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এই যে জিনিষটা তার ভিতরেতে অনেক কিছু আছে—দহরাকাশ·········মহাপ্রকাশ যখন প্রকাশ হ'ন তখন ঐখানটা প্রকাশ থাকে। তখন ঐটা হ'ল খাঁটি জিনিষ—আমরা যেটাকে বাহ্যজগৎ বলি জগতের লোক লোকান্তর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই যে লোক-লোকান্তর মধ্যলোক অন্তরীক্ষ যত কিছু এই সমস্তগুলো বাইরের।—এই যে বাইরের জিনিষগুলো এইগুলো হচেহ্ন কাল। এইখানেতে মৃত্যু আছে, আর ঐ যে প্রকাশ যেটা দহরাকাশ ঐখানে মৃত্যু নেই—কাল নেই—কালের অতীত। কেন কালের অতীত ? সরলগতি আর এইখানে বক্রগতি—সরলগতি আর বক্রগতির ভিতরেই সবকিছু। বক্রগতিতে যারা আছে তারা কালের অধীন—ভগবানের লীলাতে থাকলেও মৃত্যুর অধীন—ব্রহ্মলোকে যেতে পারে, দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে, খুব সুখ হতে পারে, আনন্দ হতে পারে, কিন্তু শেষ আছে তার, কেননা সরলগতি নয়, বক্রগতি। সরলগতিটা প্রকাশ হবে যখন সময় আসবে আর সরলগতিকে আশ্রয় করে চারদিকে বক্রগতি থাকবে, এটাই হছে *নবমুণ্ডী। এই যে আমাদের আশ্রমেতে *নবমুণ্ডী আছেন আশ্রমের বাইরেতে, এটা বাইরে দেখানোর জিনিষ —আর কুমারী বলা হয় বা গুরু বলা হয় এটা হচ্ছে centre—এটা হৃদয়—তাঁর representative। আর *নবমুণ্ডী যেটা এই জগতের জীব তাঁকে আশ্রয় করেছে—কালের জগৎ কিন্তু কালের বাইরে আশ্রয় পেয়েছে। সাধারণ লোকে তা বুঝবে না। সেটা প্রকাশের সময় এখনও আসেনি। প্রকাশ যা কিছু হয়েছে লীলা আর বিন্দুতে হয়েছে। কিন্তু সে লীলাটা যোগমায়ার মধ্যে। আর যেখানে আসল প্রকাশ সরলগতি—সেখানে যোগমায়া কোথায় ? যোগমায়া হতে গেলেই তো বক্রগতি হয়ে যাবে। 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।'

প্রশ্ন ঃ তাহ'লে "নবমুণ্ডী মাকে কালের মধ্যে কালাতীত বলে ধরে' নিতে পারি ?

উত্তর ঃ "নবমুণ্ডী কালের মধ্যে নয়—কালটা যখন কালাতীতের মধ্যে যায় তখন সেটা "নবমুণ্ডী হয়। উল্টো করে নাও, কালাতীত যেটা সেটা হৃদয়। সরলগতি যেটা সেটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠস্থান। সেটার প্রকাশ নেই, সেটা অব্যক্ত। ভগবানের অব্যক্ত স্থান যেটা, সেখানে যেতে হলে "নবমুণ্ডীর মাধ্যমে যেতে হয় অর্থাৎ কালের সম্বন্ধটা ওর সঙ্গে যোগেতে হয়। তাহলে সেটা হৃদয়েতে প্রবেশ হ'ল অথচ বাইরের। এই হচ্ছে "নবমুণ্ডী। সাধারণতঃ জীবজগতের যা কিছু সকলেই পাবে সেটা—"নবমুণ্ডীকে আশ্রয় করে পাবে। এখন হৃদয়েতে যাবে কে? অধিকারই নেই। সরলগতি কোথায় আছে? অনেক ব্যাপার আছে। প্রকাশ! যোগতত্ত্বের মধ্যে অনেক কিছু আছে। অনুরেখা। প্রকাশের ভিতরে হবে সেটা। এটা অতি গুপ্ত জিনিষ, চার যুগের মধ্যে প্রকাশ নেই, এখনও প্রকাশ হয়নি। এগুলো বলা বৃথা কেননা তুমি নিজে বলতে পারবে না—কাউকে বোঝাতে পারবে না। আর দরকারও নেই। "নবমুণ্ডী পর্যন্ত অধিকার আছে—"পঞ্চমুণ্ডীতে গেলে সেটা থাকে না।

সিদ্ধি-জ্ঞান-পূর্ণত্ব

বাবার সঙ্গে প্রসঙ্গ করছিলাম স্তোত্রপাঠ নিয়ে—স্তোত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা নিয়ে।

বাবা উত্তরে বললেন ঃ বড় বড় অনেক সাধু স্তোত্র পাঠ ক'রে সিদ্ধিলাভ করে কিন্তু জ্ঞান হয় না কিছু। সিদ্ধিলাভ হচ্ছে শক্তির ক্রিয়া। কিন্তু বোঝা চাই—এটা বড় কঠিন। স্তোত্রপাঠ করতে করতে সিদ্ধিটা mechanically হয়ে যায়। সিদ্ধিলাভ করে কি লাভ হ'ল—লক্ষ লক্ষ সিদ্ধপুরুষ আছে, কিন্তু জ্ঞানীলোক ক'টা আছে? অলৌকিক শক্তি ধরে নিতে পারে—সিদ্ধি এসে যায়—তাতে কি হয়? তা'র মধ্যে অহংভাব রয়ে গেছে—প্রকৃত জ্ঞান কই? জ্ঞান-অজ্ঞান, ভালমন্দ, সকলের অতীত হয়ে গিয়ে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে—অথচ কোনটার মধ্যে নেই—এ হ'ল আসল। সে কঠিন জিনিষ। সিদ্ধি মানে কি? তুমি একজনকে একটা সিদ্ধাই দেখালে, তখন আরেকজন তার থেকে বড় একটা সিদ্ধি দেখিয়ে দিলো—কি হ'লো তাতে? কোন একটা জিনিষ থেকে সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ, ভাল-মন্দ, সকলের অতীত হ'য়ে সঞ্চালন করা, সেটা বড় কঠিন (প্রশ্ন—সেটা তাহ'লে জ্ঞান থেকে হয় না)? সেইটাই জ্ঞান। তারপর জ্ঞান হ'য়ে গেছে কিন্তু অজ্ঞানকে বিরোধ করে—জ্ঞান হয়ে অজ্ঞানকে বিরোধী মনে করে—সে জ্ঞান নয়, তার চেয়েও higher অবস্থা একটা আছে—জ্ঞান অজ্ঞান এক হয়ে গেছে—জ্ঞান অজ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে difference নেই। এসব বড় ব্যাপার। একটা অলৌকিক কিছু করতে পারলেই মানুষ সিদ্ধ হ'য়ে গেল। তাতে কি হলো? অলৌকিক তো কতই আছে—সত্য কই? You must find out the truth.

প্রশ্ন—যেখানে জ্ঞান অজ্ঞান এক হ'য়ে গেছে সেই যে স্থিতিটা—প্রশ্ন শেষ না করতেই বাবা উত্তর দিলেন ঃ জ্ঞান অজ্ঞান এক হ'য়ে গেছে অথচ তার মধ্যে জ্ঞানও আছে অজ্ঞানও আছে—জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান আছে, অজ্ঞানীর কাছে অজ্ঞান আছে—জ্ঞানও নেই অজ্ঞানও নেই—languageও তো ফেল করে। এসব কথাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ যাঁর থেকে emanate করছে জ্ঞান অজ্ঞান সেইই ?

উত্তর ঃ না, সেটাও না। সে তো source হয়ে গেলো, source যদি বড় হ'য় তার অন্তটাও তো বড়। নদীর তো source বড়, আবার নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে—সমুদ্র কি বড় নয় ? পাহাড় থেকে নদী আসে সেটা source, আবার সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সেটাও তো একটা বড় জিনিষ। কোনটাই বড় নয়। বড় নয় মানে তারও পরের অবস্থা আছে। সেখানে গিয়েও মনে হবে আরো নেই। তৃপ্তি হবে না—তৃপ্তির অভাব। শান্ত অবস্থাও আছে। পরম শান্ত !

প্রশ্ন ঃ নদীর যে উৎস—পাহাড় থেকে বরফ গলে নদী হয়ে এল, একটা অবস্থা। আবার সেই নদী প্রবাহিত হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো, এ আরেক অবস্থা। এই দুটো অবস্থার মধ্যে একই জিনিষ দুটো রূপ নিলো কি ?

উত্তর ঃ এ দুটির কোনটাই পূর্ণ নয়—একটা টাব্ আর একটি টিউব। এমনও আছে যেখানে টাব্ও নেই, টিউবও নেই।

প্রশ্ন ঃ আবার সেই সমুদ্রের জলই তো বাষ্পে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং বরফে পরিণত হচ্ছে ?

উত্তর ঃ ওই একই কথা তো। একটা origin দেখতে পাচ্ছো—তার source একটা আছে। আবার সেই originটা গিয়ে যখন অবস্থান্তর হ'য়ে গেলো তখন আরেকটি অবস্থা। এই দুটো অবস্থা দুটো নয়—দুটোর মধ্যে একটাই আছে। এই দুটোর মধ্যেও একটাই দেখবে তবে তো ? তা না হলে অদ্বৈত দৃষ্টি হ'লো কি করে ? পূর্ণ যে সত্তাটা—সেই সত্তাটাই আসল। 'অ' থেকে আরম্ভ আর 'হ' ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ। প্রথম স্বরবর্ণ শেষ হ'লো, তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ শেষ হ'লো—পূর্ণাহং পূর্ণাহন্তা।

অনন্ত শক্তি যেখানে খেলা করে সেটা একটা বড় জিনিষ। কিন্তু যেখানে শক্তি মোটেই খেলা করে না—সে অবস্থা তো তুমি জানতে পারলে না—সেটা তো অপূর্ণতা।

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্রে যে চতুর্বর্গের কথা আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সব মিলিয়ে কি একটা জিনিষ ?—complete whole ?

উত্তর ঃ এটা সাধারণ কথা। অর্থ আর কামটা হ'লো সংসারের দিক দিয়ে, ধর্মটা হ'লো স্বর্গ—সুখের রাজ্যের কথা। আর মোক্ষ হ'লো এই সমস্ত-গুলো কেটে remove করিয়ে আলগা হ'য়ে যাওয়া—এর জন্যেই সব এসে পড়ে। কিন্তু প্রেম কই ?—প্রেম ভক্তির প্রেম কই ? যে প্রেম ধর্মও নয়,

অর্থও নয়, কামও নয়, মোক্ষও নয়। সত্যকে চাও। Try to find out the truth।—তাহ'লে আর কোন অভাব থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ আমরা সাধারণভাবে মোক্ষ বা মুক্তি কথাটা যে ব্যবহার করি তার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ বন্ধন আছে ব'লে—বন্ধন যদি remove না করো তাহলে মুক্তি নেই। মুক্তি is a relative term। প্রকৃত অবস্থা তো মুক্তি নয়। মুক্তি পেতে চাই বললেই বন্ধন স্বীকার করা হলো। বন্ধন ব'লে তো কোন একটা অবস্থা নেই। যাকে আমরা বন্ধন বলি সেটাও তো স্বরূপের মধ্যেই। স্বরূপটা কি এত ছোটখাটো জিনিষ ?—সব নিয়ে অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে তার মধ্যে আছে—তাতে সবই আছে। অথচ থাকা বলেও কিছু নেই—সব আছে কিছু নেই—সেইটেই হচ্ছে আসল। অনন্ত ঐশ্বর্য আছে—সব কিছুর অধিকারী যেমন শিবের চেহারা—অনন্ত ঐশ্বর্য আছে অথচ পথের ভিখারী।

প্রশ্ন ঃ মুক্তি যেমন relative বললেন, মোক্ষকেও তো relative বলতে পারি ?

উত্তর ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়, লক্ষবার নিশ্চয়। কোন একটা অবস্থাকে দরকার আছে তাই বলে কি সেটা বড় জিনিষ ? বন্ধন বুঝতে পেরেছো ব'লে তোমার মুক্তির দরকার। তুমি যখন বন্ধন বলে feel করবে না, তখন মুক্তি কোথায় ? সর্ব অবস্থাতেই তো নিত্য মুক্ত, সে অবস্থা বড় নয় ? এর এটা হ'লো বন্ধন আছে, তারপর মুক্ত হ'য়ে গেল—এ তো relative অবস্থা। আর যখন বন্ধনই নেই সব সময় মুক্ত—আবার সব সময় বন্ধ—প্রত্যেকে যে বন্ধ হ'য়ে আছে তার সঙ্গেও তো আমি এক—কাজেই সে বন্ধন তো আমারই। তুমি আমি ছাড়া তো নয়। কাজেই বাদ দিচ্ছ কাকে ? বেশী ঢুকতে গেলে কিন্তু তুমি বলতে পারবে না—সমস্তই মিলিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ আলাগা হ'য়ে গেলেই যে চরমপ্রাপ্তি হ'লো তাহলে তো তা বলা যায় না।

উত্তর ঃ চরমপ্রাপ্তি কথাটাই যে ভুল কথা। চরমপ্রাপ্তি কথাটার দ্বারা নিজেকে ছোট করা হ'ল। চরমপ্রাপ্তি মানে লক্ষ লক্ষ প্রাপ্তি আছে—এটা তার শেষ। অনন্ত যে তাঁর কি শেষ আছে ? চরম মানে কি ? তুমি যখন বুঝবে তখন বুঝবে এর পরেও আছে, যা নাকি আমি ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারি না। সমস্ত প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ছেড়ে দাও—প্রাপ্তিও থাকবে না, অপ্রাপ্তিও থাকবে না। সে অবস্থা আছে সহজ অবস্থা। হিসাবপত্র নেই সেখানে। যেমনভাবে আছে তেমনভাবেই সুখে আছে। খেতে পাচ্ছে না তাতেও সুখে—

আবার লক্ষ লক্ষ লোককে দান করছে তাতেও সুখে—এও যা এও তাই। তারপর খেলা করবার জন্য একটা অবস্থা নিতে পারো। কোনটাই বলা যায় না এর পরে আর কিছু নেই। পূর্ণাবস্থা যে অনুভব করেছে, সে মনে করে সবই ঠিক—সঠিক বলছে সেটাও ঠিক।

তারও তো একটা স্থিতি আছে। নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দ আছে, সেই আনন্দ। ব্রহ্মের যে আনন্দরূপ সেইটা পেলে আর কিছুতেই ভয় পাচ্ছি না, নইলে সব জায়গায়ই ভয়। কোন সংকোচ থাকবে না, যেমন আছে তেমনি ঠিক আছে।

[বাবাকে বললাম, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সেই কথা ঃ "অনন্ত বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়"—একথার কোন উত্তর দিলেন না।]

আবার বললেন, তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছো—খুঁজবে কেন? যখন যেখানে আছো সেখানেই প্রাপ্তি—সব ঠিক আছে, তর্ক-বিতর্ক করে দেখবে পরপর সব আছে। প্রাপ্তির পর দেখবে কিছু নেই সেখানে—আছে সেখানেই শান্তি। দুঃখ আছে তাতেও ঠিক আছে—সবই এক কথা, difference নেই কিছু। দুঃখ তখনই হয় যখন অভাব থাকে। আর যদি সেটা খেলার জন্যে হয় তাহ'লে দুঃখ কোথায়! সমস্ত লীলাটাই খেলা। দুঃখ তো দরকার। তা না হলে খেলা হবে কি করে? একজনকে হারতে হবে একজনকে জিততে হবে। অথচ হারাটাও খারাপ নয়, জিতাটাও ভাল নয়। হারও থাকবে—জিতও থাকবে অথচ হার-জিতের মধ্যে বিষটা থাকবে না—বিষদন্ত থাকবে না।............

প্রকৃত পূর্ণত্ব কোথায়? প্রকৃত পূর্ণত্ব সেইখানে যেখানে কান্না আছে—যেখানে কাঁদছো তুমি ভেতর থেকে।—কেননা পূর্ণের ভিতরে ঢুকে কাঁদছি—এই কান্নাটা আসা চাই—এই কান্নাটা না আসলে ভাল হয় না। বড় হয়েও যখন কাঁদতে পারে—যত বড়ই সে হোক সে তখন ছোটই। আমি বড় হ'লাম মানেটা আমি ছোট। ভেতরে যখন ঢুকবে একেবারে পাগল হয়ে যাবে—নিজের পূর্ণত্ব দেখে নিজেই বলবে এ তো অপূর্ণ। অপার ভালবাসা যদি থাকে তাহ'লে তাকে পূর্ণত্ব দাও না কেন! তুমি আমি সকলেই পূর্ণ হ'লে তাহ'লে তো এক পূর্ণই আছে—স্বয়ং পূর্ণ।

পূর্ণকে বুঝবে কি করে? যদি অভাব না থাকে। অভাবও চাই খেলবার জন্যে। খেলতে হ'লে জয়-পরাজয় দুইই দরকার। তবে তো খেলা

হয়। খেলে শুধু জিততেই হবে তাহ'লে খেলার আনন্দ পাবে? অনেক রহস্য আছে।

প্রশ্ন ঃ পূর্ণের ভিতরে ঢুকে যে কান্না আসছে—যে অপূর্ণ আছে তার জন্যে নয় কি?

উত্তর ঃ হাঁ, তার জন্য—তাকেও তো পূর্ণ করতে হবে। সে যদি পূর্ণ হ'য়ে গেল তাহলে তুমি থাকো কোথায়! অপূর্ণ তো নেই—তাহ'লে পূর্ণ শব্দের অর্থ নেই কিছু। কাজেই পূর্ণ অপূর্ণ কথার অর্থ নেই—শুধু ব্যবহারিক কথা। যেখানে খেলা নেই সেখানে চুপচাপ—কিছুই বলা যায় না। বলতে গেলে টুকরো হয়ে যাবে—ভেঙে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বলা হয় মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।—প্রশ্ন শেষ করবার পূর্বেই বাবা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন 'এ তো ঠিক কথাই।' পরিপ্রশ্ন করলাম, কোন পর্যন্ত গেলে বুঝতে পারবো ভগবান লাভ হ'লো?

উত্তর ঃ নিজেই বুঝতে পারবে—ভগবান মানে, যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়, এই ভাবটা মনে থাকলেই ভগবান লাভ হ'লো। তারপর দেখবে এটাও কিছু নয়—সে অনেক উপরের জ্ঞানের কথা। ভগবান মানেই হচ্ছে পূর্ণ জিনিষ। পূর্ণতা মানে আমি যতটা বুঝি ততটা মনে করি, পরে যখন ideaটা expand করে তখন দেখা যায় এটা কিছু নয়—আরও আছে, আরও আছে। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে চেনা—এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। ক্ষুদ্রের চেয়ে ক্ষুদ্র সেও তো আমি—বৃহতের চেয়ে বৃহৎ সেও তো আমি। আমি ক্ষুদ্রও নই, বৃহৎও নই—সেও আমি। আবার আমি বলে কোন জিনিষ নেই—এ সব সত্য; তবে তো জায়গামতো গেলে, না হলে তো এক একটা position হলো। আমিকে রাখতে চাও, রাখতে পারো, না রাখতে চাও, না রাখতে পারো, পূর্ণ আমি হতে চাও, পূর্ণ আমি হতে পারো, শূন্য আমি হতে চাও, শূন্য আমি হতে পারো। তাছাড়া আমি পূর্ণও নই, শূন্যও নই—তাও হতে পারি। Possibility সব আছে। [বললাম, পূর্ণ আমি'র কথা অনেকবার আপনার কাছে শুনেছি—কিন্তু শূন্য আমির কথা বিশেষ শুনিনি। উত্তরে বাবা বললেন, শূন্য আমি তো রয়েছে বৌদ্ধদের, শূন্যবাদীরা তো রয়েছে—নাগার্জুন প্রভৃতি]।

প্রশ্ন ঃ উপমাস্বরূপ বলতে পারি হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে যেমন বলা চলে না হিমালয়কে জেনেছি কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে বলতে পারি তার পাদদেশে এসেছি, ঠিক ঐ উপমা দিয়ে কি বলতে পারি ভগবানের পাদদেশে পৌঁছেছি?

উত্তর ঃ না, তা বলা যায় না। সে এত বিরাট, যে এত বড় জিনিষ তার পাদদেশে গেলে বুঝবে কি করে যে তার পাদদেশে এসেছো ? বুঝবার উপায় নেই, তবে শোনা কথা অনুসারে বলতে পারো। আমি নিজেকে locate করবো কোথায় !—infinite একেবারে—actual infinite—যেখানে যাবে চারদিক দিয়ে infinite। যে বিচারশীল নয়, যে জানে না, সে কোন একটা অবস্থাকে পূর্ণ মনে করতে পারে।

পরিপ্রশ্ন ঃ কিছুদিন যাবৎ আমার মনে একটি প্রশ্ন তোলপাড় করছে যে কোন্ পর্যন্ত গেলে বুঝতে পারবো ভগবান লাভ হলো ?—কেননা infiniteকে জানার তো অন্ত নেই।

উত্তর ঃ তুমি ভগবান লাভের কথা বলছো ?—কত বড় বড় জ্ঞানী রয়েছে তারা তো ভগবান মানতেই চায় না, ভগবান একটা ছোট জিনিষ। তার যে কল্পনা আছে ভগবান সম্বন্ধে, তা transcend হয়ে যাবে। তার অনেক পরে যেতে হবে—যেখানে ভেদ হ'য়ে যায়। বৌদ্ধদের কথাই ধর না কেন, প্রজ্ঞা-পারমিতার অবস্থা যদি আসে এক একটা stageএতেই ভগবানের মত অবস্থা হয়, কি করবে তাহলে ? কাজেই affirmation, negation যে কোন দিক দিয়ে যাওয়া তোমার শেষ হয় না। যেখানে শেষ হয়ে যাবে সেখানে শেষের শেষ আছে—তখন কিছুই থাকে না, কিছু থাকে না, যে, তাও থাকে না। বল তুমি কিছু থাকে না, ভাষার কতটুকু ক্ষমতা। আবার একটুখানি ঘুরিয়ে দাও, সব থাকে। কিছুই নেই, আবার সমস্ত কোটি কোটি কল্পের পূর্বে যা ছিলো তাও থাকে—সেও আছে। গেল কোথায় ? যাবে কোথায় ? সব থাকে না যেমন সত্য—সব আছে এটাও সত্য। মাথা ঘুরে যাবে না ?

[পরিপ্রশ্ন করলাম, এর একটা দিক রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিতে চেষ্টা করে-ছিলেন—বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ রবিঠাকুর তো ভাবের দিক দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যারা নাকি ক্রিয়ার দিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে তাদের দিকও তো আছে।]

পরিশিষ্ট

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

কর্মী কি দেখে? জ্ঞানী কি দেখে? ভক্ত কি দেখে? এক বা স্বয়ং কি দেখে?

কর্মী বিষয় দেখে না। দেখে শক্তির খেলা। সর্বত্র শক্তির খেলা। অন্য লোকে যেখানে রূপরসাদি জগৎ প্রপঞ্চ দেখে, কর্মী দেখে সেখানে শক্তির খেলা। প্রকৃতির রাজ্য। জ্ঞানী শক্তির খেলা দেখে না—দেখে সর্বত্র এক শান্ত সত্তা প্রকাশময়ভাবে বিরাজমান। সর্বত্র আত্মা স্থির বিরাজমান। ভিতরে বাইরে একই। খেলা নেই, নিষ্ক্রিয় স্থির। যা কিছু খেলা মিথ্যা প্রকৃতির জাল—ছায়াময়। পূর্ণাবস্থায় প্রকৃতির খেলা থাকে না—দৃষ্ট হয় না। ভক্ত দেখে সর্বত্র লীলাময় ভগবান। শক্তির অতীতেও খেলা আছে—তা প্রকৃতির খেলা নয়। লীলাময়েরই লীলা। প্রাকৃত নয়—সব অপ্রাকৃত। লীলাময়ের ইচ্ছাই অনন্ত বৈচিত্র্যসহ বিলসিত হচ্ছে। নিত্য লীলা।

তারপর যা', তা' অতি গুহ্য। আত্মারামের কথা—স্বয়ংএর কথা—একের কথা। সে নিজেকেই নিজে দেখে। দ্বিতীয় কোথায়? সব আছে—অথচ একই যে সব সেজে আছে। সব সেজেও একই থাকে।

কর্মীর স্থিতি আজ্ঞাচক্রে। তখন মন একাগ্র। তারপরই তো জ্ঞান—তৃতীয় নেত্র, ষট্‌চক্রভেদের পর। জ্ঞানীর স্থিতি হয় পরম জ্যোতিতে, সহস্রারে, সেটাই চিদাকাশ। ভক্তের স্থিতি হয় সহস্রদল কমলে। সেখানে রস-পান, অমৃতধারা পান আছে।

এক=ব্রহ্মরন্ধ্র। তারপর অব্যক্ত। স্বয়ং।

কর্মী সর্বত্র দেখে শক্তির বা প্রকৃতির খেলা—এটাই ক্রিয়া। জ্ঞানী দেখে জ্ঞান। ভক্ত দেখে ভগবানের ইচ্ছা।